মরু-মায়া

শ্রীঅমলা দেবী

কল্লোল প্রকাশনী
কলিকাতা - ১২

প্রথম সংস্করণ
কার্তিক, ১৩৬৭

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী শোভা রায়
কল্লোল প্রকাশনী
এ ১৩৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীগজেন্দ্রনাথ চৌধুরী
প্রিন্টার্স কর্নার প্রাইভেট লিঃ
১, গঙ্গাধর বাবু লেন
কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদপট-শিল্পী :
শ্রীবেণুধর ভট্টাচার্য

মূল্য : তিন টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা

শ্রীসলিলকুমার গুপ্ত

কল্যাণীয়েষু—

॥ ১ ॥

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা প্রায় দশটা। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে মাঝারি গোছের একটি রেল স্টেশনে একটি আপ-ট্রেনের আসার সময় আসন্ন-প্রায়। প্লাটফর্মটি যাত্রীতে ভরে উঠেছে। যাত্রীদের সকলের মুখেই উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছে: যে রকম ভিড়, গাড়িতে উঠতে পারলে হয়। খালাসীরা হাত-গাড়িতে মাল-পত্র যথাস্থানে নিয়ে চলেছে। স্টেশনের অফিসের মধ্যে কর্মব্যস্ততা সুপরিস্ফুট। টকটক শব্দে স্টেশন থেকে স্টেশনান্তরে বার্তা আনাগোনা করছে, টেলিফোনে কথাবার্তা চলছে; বাইরের লোকজনদের উপরে হাঁক-ডাক ও হুকুম চলছে, স্টেশন-মাস্টার পোশাক ও টুপি পরে প্রস্তুত হয়ে ঘন ঘন ঘর-বার করছেন; টিকিট-জানালার সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকজন যাত্রী টিকিট-বাবুকে টিকিটের জন্য সানুনয় তাগিদ দিচ্ছে।

প্লাটফর্মের এক পাশে একটা লিচু গাছের নিচে ভিড়টা একটু বেশী ঘন হয়ে উঠেছে। গাছের নিচে বসে একজন অন্ধ ভিক্ষুক একতারা বাজিয়ে গান গাইছে। তার পাশে বসে, তার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গাইছে একটি আট-ন বছর বয়সের ছেলে। ভিক্ষুকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেহ লম্বা, কাহিল। গায়ের রঙ আগে ফরসাই ছিল। দুঃখ-দুর্দশার আঁচে এখন মলিন হয়ে উঠেছে। মাথায় বড় বড় রুখু কাঁচা-পাকা এলোমেলো চুল। লম্বা ধরনের মুখ। গাল বসে গিয়ে গালের উপরের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে। খাড়া নাক। সারা মুখ কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়িতে ছেয়ে গেছে। চোখের তারা দুটি সাদা হয়ে উঠেছে। চোখে ছানি পড়েছে নিশ্চয়। পরিধানে খাটো ধুতি। জীর্ণ ও মলিন। ছেলেটিরও

দেহ খুবই শীর্ণ। পাঁজরার হাড়গুলো গোনা যায়। মুখখানি শুকিয়ে শুষ্ক হয়ে গেছে। বড় বড় চোখ দুটি থেকে বালকসুলভ চাঞ্চল্য এর মধ্যেই যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। ধবধবে ফরসা গায়ের রঙ অনাদরে অযত্নে মলিন হয়ে উঠেছে। পরনে একটা জীর্ণ মলিন হাফপ্যাণ্ট। সম্ভবত কারও বাড়িতে ভিক্ষে করে পেয়েছে।

ভিক্ষুকের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট। তার সঙ্গে বালকের কচি কণ্ঠের মিহি কোমল সুর মিশে মধুর সুর-সঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। সেই সুরমাধুরী শ্রোতাদের প্রত্যেকের মনকে যে স্পর্শ করেছে, তা তাদের হাবে ভাবে ও বদান্যতার বহরে বোঝা যাচ্ছে। প্রায় প্রত্যেকেই দু-একটা করে পয়সা দান করছে। ভিক্ষুক তার দৃষ্টিহীন চোখদুটি মেলে, মাথাটি ধীরে ধীরে নাড়তে নাড়তে গাইছে—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।

তাদের সামনে পাতা একটি মলিন গামছাতে কতকগুলো পয়সা জমে উঠেছে।

ঘণ্টা বাজল। গাড়ি আসতে আর দেরি নেই। সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ভিড়টি ভেঙে গিয়ে সারা প্লাটফর্মে ছড়িয়ে পড়ল।

ভিক্ষুক তখনও তেমনি ভাবে গান গেয়ে চলেছে। ছেলেটি বলল, বাবা, সব চলে গেছে। গাড়ি আসবে এখনই। বাইবে চল।

ভিক্ষুক গান বন্ধ করে বলল, এখনই চলে গেল? আর একটা ঘণ্টা বাজলেতো গাড়ি আসবে! চল্ তবে। কতগুলো পয়সা পড়ল?

ছেলেটি পয়সাগুলি গামছার খুঁটে বাঁধতে বাঁধতে বলল, অনেকগুলো পড়েছে বাবা। আজ একটা রসগোল্লা খাব—

ভিক্ষুক সস্নেহে বলল, বেশ তো, খাবি। ভাল করে বেঁধেছিস

তো[illegible] বাইরে বাই।

ছেলেটির হাত ধরে ভিক্ষুক ধীরে ধীরে স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে স্টেশনের সামনে রাস্তার এক পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

একটু পরেই ট্রেন এসে পড়ল। বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না এখানে। যাত্রীরা তাড়াতাড়ি যে যার কামরায় উঠে পড়ল। ট্রেন থেকে নামলও কয়েকজন। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে নামল—একজন যুবক ও একজন মহিলা। দুজনই বাঙ্গালী। যুবকের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। দীর্ঘ, দোহারা গঠন, উজ্জ্বল-শ্যাম গায়ের রঙ। যুবকটির মুখে ওর হৃদয়ের ঔদার্যের ছাপ পড়েছে; চাল-চলনে কর্ম-তৎপরতা ফুটে উঠেছে। সঙ্গের মহিলাটির বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কৃশাঙ্গী। গায়ের রঙ ফরসা। মুখখানি শুকিয়ে গেছে। ওর দুই চোখে গভীব ক্লান্তি ও নিঃসীম নৈরাশ্য ফুটে উঠেছে। পরনে সাধারণ শাড়ি। সাধারণ ভাবেই পরা। গায়ে শেমিজ। মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। পায়ে চটি। গাড়ি থামতেই যুবক তাড়াতাড়ি সঙ্গের জিনিস-পত্র নামিয়ে ফেলল। জিনিস-পত্র সামান্যই। একটা মাঝারি গোছের ট্রাঙ্ক, একটা বিছানার বাণ্ডিল। তরি-তরকারী ও টুকিটাকি জিনিসে ভরা একটা সাজি। একটা মাঝারি গোছের স্যুটকেশ। একটা কুলি ডেকে যুবক নিজেই জিনিসগুলো তার মাথায় তুলে দিল। মহিলাটি সাজিটা তুলে নেবার উপক্রম করতেই তাড়াতাড়ি সেটি নিজে তুলে নিয়ে এগিয়ে চলল। মহিলাটি তার পিছু পিছু চলল।

স্টেশনের বাইরে এল তারা। কুলি মাল নিয়ে ওদের আগেই এসে পড়েছিল। যুবক দুজন রিক্‌শওয়ালাকে ডাকল। অবিলম্বে এল তারা। কুলি একটা গাড়িতে মাল চাপাতে লাগল। কাছেই মহিলাটি দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধ ভিক্ষুক ও তার ছেলেটি ভিক্ষা চেয়ে বেড়াচ্ছিল। অবিলম্বে তার কাছে এসে হাজির হল। ভিখারীর বাঁ হাতে তার একতারাটি; ডান হাতটি প্রসারিত করে বলল, অন্ধকে দয়া কর বাবা। ছেলেটি রিনরিনে গলায় বলল, ভিখিরী অন্ধকে

দয়া করুন মা! আমাদের কেউ নেই মা! সকাল থেকে কিছুই খাই নি মা! ভিখারী বলল, নিতাইচাঁদ তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করবেন মা!

মহিলাটি একটি ছোট মনিব্যাগ থেকে একটি আনি বার করে ভিখারীর হাতে দিতে গিয়ে ভিখারীর মুখের দিকে তাকিয়েই যেন কোন মায়ামন্ত্র প্রভাবে প্রস্তর প্রতিমার মত স্তব্ধ হয়ে গেল। অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় দর্শন-লাভ-জনিত বিপুল বিস্ময় ফুটে উঠল ওর মুখে ও চোখে। কিছুক্ষণ ভিখারীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়? তুমি কি—

মহিলার কণ্ঠস্বব শোনামাত্র ভিখারীর মুখেও ফুটে উঠেছিল বিস্ময়। দৃষ্টিহীন চোখ দুটি প্রসারিত করে মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। মহিলাটির কথা শেষ হতে না হতেই বলে উঠল, আমার নাম গৌরদাস, আমার বাড়ি হাওড়া জেলায়, সাঁকরেলের কাছে সিন্দুরহাটী—জাতে বৈষ্ণব আমরা।

মহিলা জিজ্ঞাসা কবল, এটি কি তোমাব নিজেব ছেলে?

হ্যাঁ, মা।

এখানে কতদিন এসেছ?

মাস চার-পাঁচ আগে।

কোথায় থাক তোমরা?

ছেলেটি হাত বাড়িযে বলল, ওই যে একটা গাঁ রযেছে—ও গাঁয়েই একটা পোড়ো বাড়িতে।

যুবক ডাক দিল, দিদি, আসুন। মহিলা মুখ ফিবিয়ে বলল, এই যে, যাচ্ছি ভাই। ভিক্ষুককে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, কখন বাড়ি ফিরবে তোমরা?

ভিক্ষুক বলল, এখনই যাব মা। রান্না করে দু মুঠো খেতে হবে তো? পথের ভিখিরীরও যে পোড়া পেট আছে মা! দুটো না গিললে চলে না।

আবার ডাক পড়তেই মহিলাটি চলে গেল

স্টেশন থেকে একটা লাল কাঁকরের রাস্তা সোজা দক্ষিণ দিকে কতকটা গিয়ে একটি ছোট পুলের উপর দিয়ে একটি ছোট নদী পার হয়ে, চওড়া পিচের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। এই রাস্তাটা পূর্ব দিক থেকে এসে পশ্চিম দিকে চলে গিয়েছে। ছু পাশেই দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। ডান পাশে সারা মাঠ জুড়ে এখানে-সেখানে বিস্তর কলিয়ারী। চিমনিগুলোব উদ্‌গীর্ণ ধূমে সারা আকাশ ধূম-মলিন হয়ে উঠেছে। বাঁ পাশে ছোট নদীটা কতকটা দূর রাস্তাটির সঙ্গে সমান্তরালে গিয়েছে। তারপর দক্ষিণ দিকে মুখ ফিরিয়ে বন-নীল দিগন্ত পর্যন্ত গিয়ে হাবিয়ে গেছে। দিগন্তের এক পাশে একটা পাহাড় গাঢ় নীল রঙের বিরাট জন্তুর মত শুয়ে বযেছে। এখানে-সেখানে ছু চারটে গ্রাম। নদীর বাঁকেব মুখেই একটা ছোট গ্রাম। মাঠের মাঝ দিয়ে একটি পায়ে-চলা পথ চলে গিযেছে ওই গ্রাম পর্যন্ত। বড় রাস্তাটা ধরে আরও কতকটা গেলেই ছু পাশে কয়েকটি কল। ডান পাশে একটা টালি-কল। বাঁ পাশে পর পর তুটো কল—একটা তেলের আর একটা ধানেব। তারপব ছু পাশেই টালি-ছাওয়া পর পর ছোট ছোট কয়েকটা একতলা বাড়ি। তাবও পর বাস্তার ছু পাশে কযেকটি দোকান—খাবারের দোকান, মনোহাবী দোকান, কাপড়ের দোকান, দরজির দোকান, মসলাপাতির দোকান ইত্যাদি। তারপর ডান পাশে একটা কাঠেব গোলা। আব এক পাশে একটা বস্তি—খোলা দিয়ে ছাওয়া ছোট ছোট কতকগুলো মাটির বাড়ি। কুলিরা থাকে এখানে। এরই কতকটা দূরে বাঁ পাশ থেকে একটা কাঁচা রাস্তা বেরিয়ে অদূরবর্তী ছোট গ্রামটার ধার ঘেঁষে পিছনের আর একটা গ্রামের পাশ দিয়ে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। তারপর ছু পাশে ফাঁকা মাঠ। কতকটা দূরে রাস্তার ডান পাশে একটা একতলা বাড়ি। বাড়িটি নেহাত ছোট। সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। আগে বোধ হয় এখানে বাগান ছিল। এখন তার চিহ্ন মাত্র নেই। বাড়িটির সামনের দিকে টানা বারান্দা। টালি দিয়ে ছাওয়া।

এই বাড়িটার সামনেই ছুটো রিক্‌শ এসে থামল। একটা থেকে

[illegible] যুবক ও মহিলা। যুবক ডাক দিল, মদন! মদন! ডাক শুনেই একটি বার তের বছরের ছেলে ছুটে এল। কাছে আসতে না আসতেই যুবক বলল, শিউশরণ কোথায়?

ছেলেটা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ঠাকুর? রান্না ঘরে—

যুবক বলল, ওকে ডেকে নিয়ে আয়।

ছেলেটা পিছন ফিরে ছুটল।

কিছুক্ষণ পরে ছেলেটির সঙ্গে ঠাকুর এসে হাজির হল। বেহারী। লোকটির বয়স ষাটের উপরে। এখনও বেশ শক্ত-পোক্ত। এখনও কাজ কববার যে ক্ষমতা আছে, তা ওর চাল-চলনে বেশ বোঝা যায়।

যুবক লোকটিকে বলল, জিনিসগুলো নামিয়ে বাড়িতে নিয়ে চল।

মহিলাকে বলল, আপনি যান। আমি এখন চলি, সন্ধ্যের পব আসব।

মহিলা বাড়ির দিকে চলল। জিনিসপত্রগুলি নিয়ে যাবার পব যুবক একজন রিক্‌শওয়ালাকে বিদায কবে দিয়ে, আর একটা রিক্‌শয় চড়ে সামনের দিকে চলল।

এই রাস্তাটা ধরে কতকটা গেলেই বাঁ পাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা কারখানা। তাব পরেই বাঁ পাশে কয়েকটা ছোট ছোট বাড়ি টালি দিয়ে ছাওযা। কারখানাব ছোট ছোট চাকুরেবা থাকেন এখানে। ডান পাশে পর পর কয়েকটা বাংলো। এখানে থাকেন ম্যানেজার ও আর আর বড় চাকুবেরা। এব কতকটা পরে একটা লাল কাঁকরের রাস্তা বড় বাস্তা থেকে বেরিয়ে সোজা উত্তব দিকে চলে গেছে। ওই রাস্তা দিয়ে ও-দিকেব অনেকগুলো কলিযাবীতে যাওযা যায়।

যুবকটির বিক্‌শ এই রাস্তা ধরে চলে গেল।

॥ ২ ॥

বেলা প্রায় একটা। বাড়ির সামনেব বারান্দায় মেয়েটি দাঁড়িয়েছিল। স্নান করেছে। ভিজে চুলগুলি পিঠে লুটিয়ে পড়েছে। মাথায় অবগুণ্ঠন নেই। পরেছে একটা সাধাবণ শাড়ি ও শেমিজ। সামনে

বিস্তীর্ণ মাঠের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ভ্রূ দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত। দাঁত দিয়ে অধরের এক প্রান্ত চেপে ধরেছে। মুখে চিন্তার গাঢ় ছায়া।

মাথায় মৃদু ঝাঁকুনি দিল মেয়েটি। জটিল চিন্তা-জালের একটা জট যেন টেনে ছিঁড়ে ফেলল। চিত্রার্পিতবৎ নিশ্চল মূর্তি মুহূর্তে সচল হয়ে উঠল। ধীব পদক্ষেপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বারান্দার কোলে লাল কাঁকবেব রাস্তা দিযে বাড়ির পিছনের দিকে চলল।

একটু দূবেই রান্না-ঘব। রান্না-ঘরের সামনে কুয়ো। কুযোর কাছে বসে মদন বাসন মাজছিল। মেয়েটি তার পিছনে গিয়ে ডাক দিল, মদন! মদন চমকে পিছন ফিরে তাকিযে মেয়েটিকে দেখেই তাড়াতাড়ি হাতটা ধুযে কাছে এসে বলল, কী বলছেন দিদি! মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, ঠাকুর কোথায়? মদন বলল, বাজারে ওদেব দেশের লোক আছে, তার সঙ্গে দেখা কবতে গেছে। বোজই যায়, আমাকে একা ঘর আগলাতে হয।

তোদেব বাড়ি তো ওই গাঁয়ে, না?

হ্যাঁ, দিদি।

তুই বাড়ি যাস না?

যাই মাঝে মাঝে। মাকে একবাব দেখেই চলে আসি।

তোব মা কেমন আছে?

ভাল নাই দিদি। আব বেশী দিন নয়। —মুখখানি ম্লান করে তুলে একটু চপ করে থেকে বলল, আপনি মায়ের জন্যে যে কাপড়টা কিনে দিযে গেছলেন, একেবারে ছিঁড়ে গেছে। একটা গামছা পরে থাকতে হচ্ছে মাকে। আর একখানা কাপড়—

মেয়েটি বলল, দেব একখানা কাপড় কিনে। কাল ডাক্তারবাবু এলে মনে কবিযে দিস। একটা কাজ করতে পারিস?

মদন সাগ্রহে বলল, খুব পারব। কী করতে হবে বলুন?

মেয়েটি বলল, তোদের গাঁয়ে একটা পোড়ো বাড়ি আছে না?

আজ্ঞে হ্যাঁ, চক্রবর্তীদের বাড়ি—গাঁয়ের এক ধারে। সব মরে গেছে ওদের। বাবুদের কাছে দেনা ছিল অনেক। বাবুরা বাড়িটা

নিয়ে নিয়েছে। —একটু চুপ করে বলল, ভূতের-বাড়ি। চক্রবর্তীদের কে একজন নাকি গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল। সে ভূত হয়ে আছে বাড়িটাতে। অনেকে দেখেছে। সন্ধ্যের পর ও বাড়ির পাশ দিয়ে কেউ যায় না।

মেয়েটি বলল, তোকে কিন্তু একবার যেতে হবে। এখনও অনেক বেলা রয়েছে। সন্ধ্যে হতে ঢের দেরি—

মদন বলল, আজ্ঞে, এখন ভয় কিসের? এখন আমি খুব যেতে পারব। তবে, ওখানে কী জন্যে যেতে হবে?

মেয়েটি বলল, একজন কানা ভিখিরী আর তার ছেলে ওখানে থাকে, দেখেছিস?

মদন বলল, আমি দেখেছি ওদের। গান শুনেছি। খুব ভাল কীর্তন গায়। বাজারে এক দিন গাইছিল। মাস চার পাঁচ আগে বুড়ো কর্তাবাবু কোত্থেকে ওদের এনেছিলেন। খুব ভক্তলোক ছিলেন কি না! কীর্তন শুনতে খুব ভালবাসতেন। এনে নিজের বাড়িতেই রেখেছিলেন। মাস তিন আগে কর্তা গিন্নী দুজনেই মারা গেলেন। ছেলেরা বাড়িতে আর রাখতে চাইল না। তবে তাড়িয়ে দেয়নি একেবারে। পোড়ো বাড়িটাতে থাকতে দিয়েছে।

মেয়েটি বলল, ভূতের বাড়ি বলছিস যে! ওদের ভয় করে না?

মদন বিজ্ঞের ভঙ্গীতে বলল, ওদের ভয়-ডর করলে চলবে কেন দিদি! পথের ভিখিরী। পথের ধারে পড়ে থাকার চেয়ে ঢের ভাল তো!

মেয়েটির মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বলল, পথের ভিখিরী! তাই তো বটে। মুখে বলল, ঠিক বলেছিস তুই। একটু চুপ করে থেকে বলল, কাজ সারা হলে একবার ওখানে গিয়ে খবর নিবি, ওরা ওখানে সত্যি থাকে কি না; আর কখন বাড়িতে থাকে।

মদন জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কীর্তন শুনবেন? বলেন তো বলে আসব। বললেই আসে।

মেয়েটি বলল, তোকে কিছু বলতে হবে না। তুই দেখে আসবি।

আর কখন ওদের ওখানে দেখা পাওয়া যাবে, জেনে আসবি।

মেয়েটি ফিরে এল অবিলম্বে। বারান্দায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বাড়ির ভিতর থেকে একটা ডেক চেয়ার এনে বসে কি সব ভাবতে লাগল।

জ্যৈষ্ঠের খররৌদ্রে পৃথিবী নিঃশব্দে পুড়ছে। আকাশে শান দেওয়া ছুরির ফলার ঔজ্জ্বল্য। যেন পৃথিবী যন্ত্রণা ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ধূলি ধূসর দিগন্তরেখা। দূরে ছোট নদীটার বুকের উপরে উত্তপ্ত বালুস্পর্শে বাতাস কাঁপছে। মাঝে মাঝে মাঠের দিক থেকে গরম হাওয়ার হল্‌কা এসে মুখ-চোখ ঝলসে দিচ্ছে। বাড়ির সামনে একটা শিরীষ গাছে একদল ছাতারে পাখি মাঝে মাঝে কলরব করে উঠছে। সামনে বড় রাস্তায় লরি ও বাস গর্জন করতে করতে ছুটছে। দূরে তেল ও ধান-কল চলার শব্দ অস্পষ্ট ভাবে কানে আসছে। মেয়েটি প্রস্তর মূর্তির মত স্থির ভাবে বসে আছে। দুটি প্রসারিত চোখের দৃষ্টি দূর দিগন্তের পানে নিবদ্ধ। কর্ম-চঞ্চল পৃথিবীর কোন ইঙ্গিত তার মনে পৌঁচচ্ছে না। মন তার এখানে নেই। চলে গেছে তার অতীত জীবনের মধ্যে। যে-জীবন থেকে ভাগ্যদোষে ছিটকে পড়ে দুর্ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সে অশেষ দুর্গতির মধ্যে এসে পড়েছে, যে-জীবনকে সে আর কোনদিন কোনমতে ফিরে পাবে না, সেই জীবনের স্মৃতি অপূর্ব সুষমায় মণ্ডিত হয়ে তার মানসচক্ষের সামনে ভাসছে। এই স্মৃতিকণাগুলি তার মনের এক অন্ধকারময় কোণে এতদিন জড়ো হয়েছিল। ক্রীতদাসী জীবনে মায়ামমতাহীন বিচার বিবেচনাহীন প্রভুদের অশেষ দাবি মেটানোর স্বল্প অবসরে হয়তো মাঝে মাঝে তারা মনের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, আবার অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। আজ অন্ধ ভিক্ষুক ও ছেলেকে দেখার পর, তাদের পরিচয় পাবার পর, এক ঝলক আলো এসে পড়েছে মনের সেই কোণে। তার কর্মভার থেকেও কিছুদিনের জন্য তার দেহ ও মন দুই মুক্তি পেয়েছে। তাই আজ মন সেই স্মৃতিকণাগুলিকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া হারিয়ে যাওয়া বহুমূল্য রত্নকণার

'মত পরম আনন্দ ও কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে।

* * *

সব মনে পড়ছে আজ—

পশ্চিমবঙ্গে একটি মাঝারি গোছের শহর—নাম স্বপনপুর। সেই শহরের একপ্রান্তে একটা পাড়া। বেশী লোকের বাস ছিল না। কাছেই স্টেশন। স্টেশন থেকে যে বড় রাস্তাটি শহরের মাঝখান দিয়ে গেছে, তার থেকে একটা ছোট রাস্তা বেরিয়ে চলে গেছে দক্ষিণ দিকে। সেই রাস্তার ধারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটা বড় দোতলা বাড়ি। বোসদের বাড়ি। যিনি বাড়ির প্রথম মালিক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল সারদাচরণ বোস। জেলা-শহর থেকে অনেক দূরে এক পাড়াগাঁয়ে বাড়ি ছিল। ওকালতি পাশ করে, এখানে প্র্যাক্‌টিশ করতে শুরু করেন। অচিরে শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল হয়ে উঠলেন। বিস্তর টাকা রোজগার করেছিলেন। নিজের গ্রামেও বাড়ি তৈরি করালেন। জমিদারি কিনলেন। বর্তমান মালিক—তাঁর পৌত্রেরা। জ্যেষ্ঠ পৌত্রের নাম—বরদাচরণ বোস। তিনিও উকিল—পিতৃ-পিতামহের পেশাটা ত্যাগ করা উচিত নয় বলেই। তবে ওকালতিতে আয় হত না বেশী। অন্যান্য ব্যবসা ছিল—কনট্রাক্টারী, বাস-সার্ভিস, প্রেস ইত্যাদি। তাঁর ছোট ভাইয়েরা এক-একজন এক-একটি ব্যবসার তদারক করতেন। জমিদারি ও বাড়িভাড়া থেকে আয়ও বেশ ছিল। তেজারতি কারবারও ছিল। শহরে বোসদের মান-মর্যাদা বেশ ছিল। বোসদের বাড়ির পাশে একটা একতলা বাড়ি। এ বাড়িটাও বোসদের। ভাড়া নিয়ে বাস করতেন উকিল রামজীবনবাবু। জাতিতে বৈষ্ণব ছিলেন। অন্য জেলায় বাড়ি ছিল। এই শহরে এক বন্ধু ও সহপাঠী ছিল তাঁর। তার পরামর্শে এখানে প্র্যাকটিশ শুরু করেন। আয় মন্দ ছিল না। এই বাড়ি থেকে কতকটা দূরে ছিল একটা ছোট একতলা বাড়ি। এ বাড়িটাও বোসদের ছিল। তার বাবা ভাড়া নিয়ে বাস করতেন। থাকবার ঘর ছিল মাত্র দুটি। রান্নাঘরটা ছিল নেহাত ছোট।

পাশেই ছিল ভাঁড়ারঘর। বাবা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক। উঁচু ক্লাসগুলিতে অঙ্ক শেখাতেন। বাড়িতে অনেক ছেলে পড়তে আসত। বারান্দায় মাদুর পেতে বসে বাবা তাদের পড়াতেন। তাদের সংসারে মানুষ ছিল না বেশী। বাবা, বিধবা মাসীমা, সে আর দাদা। মা মারা গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। মাসীমাই মানুষ করেছিলেন তাদের। মাসীমাই সংসারের সব কাজ করতেন। সে যতটা পারত সাহায্য করত। চাকর ঝি তো ছিল না! রাখবার ক্ষমতা ছিল না। বাবা মাইনে পেতেন কম। ছেলেরা, যারা বাড়িতে পড়তে আসত, অনেকেই কিছু দিত না। দু-চারজন দিত, তাও খুব বেশী নয়। বাবার শিক্ষকতায় নাম ছিল। শিক্ষকতা তাঁর শুধু পেশা ছিল না, নেশা ছিল। অনেক ছেলে—অঙ্ক বিষয়টা যাদের কাছে বিভীষিকার বস্তু ছিল—তাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে অঙ্ক শিখেছিল, অঙ্কে পাস করেছিল। তারা স্কুল থেকে পাস করে চলে যাবার পরেও তার বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রাখত। ছুটি-ছাটাতে বাড়ি এলে বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসত।

তাদের পাড়া থেকে কতকটা দূরে একটা মধ্য-ইংরেজী স্কুল ছিল। সেখানে পড়া শেষ করেছিল সে। তারপরে আর স্কুল যাওয়া হয় নি তার। শহরে অবশ্য একটি উচ্চ ইংরেজি স্কুল ছিল। শহরের একেবারে অন্য প্রান্তে। স্কুলের বাস ছিল। বাড়িতে বাড়িতে মেয়ে তুলে স্কুলে নিয়ে যেত। স্কুলের বেতনের উপরেও প্রায় দু-তিন টাকা বেশি দিতে হয় প্রত্যেক মেয়েকে। মেয়ের লেখাপড়ার জন্য মাসে মাসে এত খরচ করা বাবার আর্থিক অবস্থায় কুলোত না। কাজেই বাড়িতে পড়ত সে। বাবার সময় ছিল না পড়াবার। খেয়ালও ছিল না। সংসারের কোন কিছুরই তো খবর রাখতেন না! মাসে যা কিছু উপার্জন হত মাসীমার হাতে ফেলে দিয়েই সাংসারিক দায়িত্ব শেষ করতেন। সংসারের সব দায়িত্ব বহন করতেন মাসীমা। সংসারে সব কাজ নিজে করতেন। যা নিজে পারতেন না তা দাদাকে দিয়ে করাতেন, দাদা না করলে অন্যদের দিয়ে করাতেন। অন্যরা

মানে—অচিন্ত্যদা, অপূর্বদা, অনাদিদা—জ্যাঠামশায়ের তিন ছেলে। জ্যাঠামশায় মানে—রামজীবনবাবু। বাবাকে নিজের ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন। অচিন্ত্যদা ছিলেন সবচেয়ে বড়। অপূর্বদা মেজো, অনাদিদা ছোট। সব বাবার ছাত্র। রোজ তাদের বাড়িতে আসত। অপূর্বদা ছিল তার দাদার পরম বন্ধু। স্কুলে-কলেজে একই ক্লাসে পড়ত। একসঙ্গে বেড়ানো, একসঙ্গে খেলাধূলো। অনাদিদা তার চেয়ে দু বছরের বড় ছিল। ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছিল তারা। খুব ভালবাসত তাকে। মারধোরও করত মাঝে মাঝে। বড় হয়ে ওঠবার পরেও তার ভালবাসা বিন্দুমাত্র কমে নি। স্কুল থেকে ফিরে খেলার মাঠে যাবার আগে একবার তাদের বাড়ি এসে মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে, তার সঙ্গে গল্প করতে, হাসি-ঠাট্টা করতে, কোন দিন ভুল হয় নি তার। মাসীমা ওকে দিয়েই প্রায় সব কাজ করাতেন। ও হাসিমুখেই করত। ওদের তিনজনই বাড়ির ছেলের মত ছিল, ছেলের মতই বাবাকে, মাসীমাকে শ্রদ্ধা করত। তাকে নিজের দাদার মত, বোধহয় তার চেয়ে বেশি, স্নেহ করত। ওদের বোন ছিল না। তাকেই তারা সেই স্থানে বসিয়েছিল।

মাসীমা অচিন্ত্যদার উপর তাকে পড়ানোর ভার দিয়েছিলেন। অচিন্ত্যদা যতদিন বাড়িতে ছিলেন তাকে নিয়মমত পড়াতেন। কলেজ থেকে পাস করে কলকাতায় ডাক্তারী পড়তে চলে গেলেন। দাদাকে মাসীমা বললেও পড়াত না। বাড়িতে থাকতই না। কলেজে না গেলেই নয়, তাই যেত। কলেজ থেকে ফিরে দুটো কিছু নাকে-মুখে দিতে না দিতেই অপূর্বদা এসে হাজির হত। তারপর দুজনে বেরিয়ে কোথায় যেত, কি করত, কেউ জানত না। ফিরত রোজ রাত করে। মাসীমা কিছু বললেই যা' তা' মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে সরে পড়ত। মাসীমা বাবাকে কিছু বলতে গেলে কান দিতেন না। কান দিলেও দাদাকে ডেকে একবার ধমকে দিয়ে কর্তব্য শেষ করতেন। অনাদিদা পড়াবে কি—নিজের পড়াশুনা নিয়েই অস্থির ছিল বেচারা!

তা হলেও প্রত্যেক রবিবার এসে কিছুক্ষণ তাকে পড়াত। মোট কথা অচিন্ত্যদা যাবার পর তার পড়াশুনার প্রায় ইতি হল।

আর একজন প্রায়ই আসত তাদের বাড়ি—বীরেনদা। বোস জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে। স্কুলে পড়ত দাদার সঙ্গে। পড়াশুনা কিছু করত না। খেলায় মন ছিল বেশী। খুব ভাল ফুটবল খেলত। স্কুলের মধ্যে সবচেয়ে ভাল খেলোয়াড় ছিল। স্কুলে খেলা-ধূলার প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বছর পুরস্কার পেত। চেহারাটি ছিল চমৎকার। ধবধবে ফরসা রঙ। লম্বা দোহারা গঠন। পেশল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। চোখ দুটো ছিল চমৎকার। চুম্বকের মত আকর্ষণ শক্তি ছিল চোখে। চোখে চোখ মিললে চোখ ফেরানো যেত না। বুকের ভেতরটা থর থর করে কাঁপত। বাবা ওকে বেশী পছন্দ করতেন না। স্কুলে দুষ্ট ছেলেদের সর্দার ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে সিগারেট খেত। বাবার চোখে নাকি একবার পড়ে গিয়েছিল। বাবা অন্য ছেলেদের ওর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করতেন। মাসীমা ওকে খুব স্নেহ করতেন। বাবার মনোভাব জেনেও তাই রোজ একবার করে মাসীমাকে দেখা দিয়ে যেত। ওর নিজের মা মারা গিয়েছিলেন ওর নেহাত ছেলে-বেলায়। ওর বড় কাকীমা ওকে মানুষ করেছিলেন। তাঁর নিজের ছেলেমেয়ে ছিল না। ওর বাবা আবার বিয়ে করেছিলেন। ওর বিমাতা ছিলেন ওর মায়ের দূর সম্পর্কের বোন: তিনি কিন্তু ওকে পছন্দ করতেন না। ওর বাবাও ওর উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। ওর বৈমাত্রেয় ভাই ছিল একজন—ধীরেনদা। বোন ছিল একটি—মিনু। ধীরেনদা অনাদিদার সমবয়সী ছিল। ছেলেবেলাতে অনাদিদার সঙ্গে এসে খেলা করত। অনাদিদার প্রাণের বন্ধু ছিল সে। মিনুর সঙ্গে তার নিজের ভাব ছিল খুব। ছোট স্কুলে একসঙ্গে পড়েছিল দুজনে। মিনু বড় স্কুলে পড়ত। সেখানে অনেক নতুন নতুন বন্ধু হয়েছিল তার। তার সঙ্গে ভাব কিন্তু বরাবর বজায় ছিল। মিনুর মা তাকে স্নেহ করতেন। ওদের বাড়ি গেলে খুব আদর করতেন। মিনুর বাবা—বোস জ্যাঠামশায়ও তাকে

স্নেহ করতেন। ধীরেনদা খুব ভাল ছেলে ছিল। স্কুলে প্রত্যেক পরীক্ষায় প্রথম হত। বাবা খুব ভালবাসতেন ওকে। ধীরেনদা কিন্তু উঁচু ক্লাসে উঠেই ফেল করতে শুরু করল। দাদা স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে যাবার পরেও ও পড়ে রইল বছর কয়েক। শেষে ধীরেনদা ওকে ডিঙিয়ে যেতেই ও পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ওর বড কাকার সঙ্গে কণ্ট্রাক্টারীর কাজ করতে লাগল।

তাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন অচিন্ত্যদা। এত স্নেহ সে জীবনে কারও কাছে পায়নি। তার সম্বন্ধে সব বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি থাকত। হয়তো শাড়িটা ছিঁড়ে গেছে, ও ভয়ে মাসীমাকে বা বাবাকে জানায়নি, দাদা দেখেও দেখেনি। অচিন্ত্যদার লক্ষ্য করতে ভুল হত না। মাসীমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন, ছেঁড়া শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? মাসীমা শুনতে পেয়ে বলতেন, কে? রাধা? শাড়িটা ছিঁড়েছে? বলেনি তো! কি করব বাবা! ও মেয়ে মুখ ফুটে কিছু বলবে না। খিদে পেলে বলে না, অসুখ হলে বলে না। মুখ দেখে আমাকে বুঝে নিতে হয়। কী যে হবে ওই মেয়ের! কে যে নেবে ওকে জানি না। বক্তৃতা চলতে থাকত মাসীমার। অচিন্ত্যদাকে দিয়েই শাড়ি আনিয়ে দিতেন। হাতে টাকা না থাকলে অচিন্ত্যদাই ব্যবস্থা করতেন। কত যত্ন করে যে পড়াতেন তাকে। তাকে বড় স্কুলে পাঠাবার জন্য খুব চেষ্টা করেছিলেন। কী করবেন! বাবা কিছুতেই রাজী হলেন না। নিজেই পড়াতে লাগলেন। মিনুর কাছে ওদের কি কি বই পড়ান হয়, জেনে নিয়ে সেই সব বই কিনে আনলেন নিজের টাকা দিয়ে। ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় দশ টাকা বৃত্তি পেয়েছিলেন। সে টাকা নিজের ইচ্ছামত খরচ করতেন, জ্যাঠামশায় কিছু বলতেন না। রোজ দু ঘণ্টা করে পড়াতেন তাকে। কলেজ থেকে ফিরে এসে খাবার খেয়েই চলে আসতেন। কোন দিন ব্যতিক্রম হত না। কোন দিন কোন অছিলায় সে পড়তে না চাইলে শুনতেন না। রাশভারী মানুষ তো! বেশি বলতে সাহস হত না। পড়তে বসতেই হত। পড়তে ভালও

লাগত। পড়তে নয়, ওঁর বুদ্ধিদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে, ভারী গলায় ওঁর কথা শুনতে ভাল লাগত। বীরেনদার মত চমৎকার চেহারা ছিল না অচিন্ত্যদার। লম্বা, ছিপছিপে গঠন। রঙ খুব ফরসা ছিল না। কিন্তু মুখ চোখ নাক ছিল খুব ধারাল। প্রশস্ত কপাল। মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে খুব ভাল লাগত তার। রাত্রে স্বপ্ন দেখত কত দিন। শুধু তখনই নয। পরে দুর্গতি ও দুষ্কৃতিব গভীর পঙ্কের মধ্যে ডুবে থেকেও অচিন্ত্যদার চেহারা নিদ্রায় জাগরণে মনের পরদায় কতবার ভেসে উঠেছে। ওঁর স্মৃতি তার মনের ফলকে যে এত গভীর ভাবে উৎকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল তা সে তখন জানত না। মন যে তাঁকে এমন করে চাইতে শুরু করেছিল, তা সে তখন বুঝতে পাবেনি। দেখতে ভাল লাগে, কথা শুনতে ভাল লাগে, ভাল লাগে ওঁব স্পর্শ পেতে—এই পর্যন্ত। কলেজ থেকে পাস করে, ডাক্তারী পড়তে যখন কলকাতা চলে গেলেন, তখন খুব মন কেমন কবত তার। বিকেল বেলায যে সময়টিতে তিনি আসতেন, মন অভ্যাসবশে তাঁব জুতোর শব্দ, সঙ্গে সঙ্গে ভাবী গলায 'মাসীমা' ডাক শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকত। প্রতিদিন বাস্তবের রূঢ় আঘাত পেয়েও মনেব এই ভুল কাটেনি অনেক দিন। ভালবাসার লক্ষণ যে এইসব—চোদ্দ-পনেরো বছর বযসেব কিশোবী মেযে জানত না তখন। তারপর দুর্দিনের কালো অন্ধকাবে যখন অচিন্ত্যদা চিবদিনের মত হাবিযে গেলেন তাব কাছ থেকে, তখন সে বুঝেছিল, তাঁকে ভালবেসেছিল সে।

অপূর্বদাকেও খুব ভাল লাগত তাব। অপূর্বদাব বঙ বালো ছিল। শক্তিমান দেহ ছিল তার। বোজ কুস্তি কবত। শ'খানেক ডন টানত, শ'দুই বৈঠক। মুখের গঠন ছিল সুন্দর। চোখ দুটি ভাবী সুন্দর। টানা টানা চোখ। মনে হত যেন সর্বদা স্বপ্ন দেখছে। সুন্দর স্বপ্ন। তাবই ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে ওর চোখের কালো তারায।

স্বপ্নই দেখত সে! পরাধীন ভারতের শৃঙ্খল-মুক্তির স্বপ্ন। গোপনে বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছিল। কেউ জানত না। কে জানবে? ওদেরও তো মা ছিলেন না! এক বুড়ি পিসীমা ওদের

[illegible] দেখাশোনা করতেন। জ্যাঠামশায় তো নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অচিন্ত্যদা যত দিন বাড়িতে ছিলেন, যতটা সম্ভব অপূর্বদার ও দাদার খোঁজখবর রাখবার চেষ্টা করতেন। তিনি কলকাতা চলে যাবার পর ওরা দুজনে যা ইচ্ছে তাই করতে লাগল। তাকে নিয়মিত ভাবে পড়াবার জন্য অচিন্ত্যদা ওদের দুজনকে বার বার বলে গিয়েছিলেন। বাড়িতে থাকলে তো পড়াবে! অপূর্বদার পিসী-মাকে যদি সে বলত, হ্যাঁ পিসীমা, ওরা দুজনে যে কি করছে, জ্যাঠামশায়কে একটু খবর নিতে বলুন না। বাবা তো কোন কথায় কান দিতে চান না। পিসীমা সক্ষোভে বলতেন, তোমার জ্যাঠামশায়টিও তাই, মা। নিজের কাজ নিয়েই আছে। ছেলে যে বয়ে যাচ্ছে খেয়াল নেই। আমি কী করব মা! যা আছে ওর অদেষ্টে হবে -

অপূর্বদা গান গাইত চমৎকার। উঁচু ভারী গলায় গান গাইত। নজরুলের গান—'শিকল পরা ছল আমাদের, শিকল পরা ছল, বল ভাই মাভৈ মাভৈ, নব যুগ ওই আসে ওই।' এমন দরদ দিয়ে গাইত, শুনতে শুনতে বুকের ভেতরটা কেমন করতে থাকত। মনে হত, ভারত-মাতার শৃঙ্খল-মুক্ত মূর্তিখানি ও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, নব-যুগের পদধ্বনি যেন ও কানে শুনতে পাচ্ছে। অপার্থিব আনন্দের প্রভায় ওর চোখ-মুখ জ্বলজ্বল করত।

অপূর্বদারা ওদের স্বজাতি ছিল। মাসীমা প্রায়ই বলতেন, অচিন্ত্যর হাতে তোকে যদি দিয়ে যেতে পারি! ওঁর পিসীমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন। ওঁরও অমত ছিল না। বলতেন, বেশ হবে। রাধা বড় লক্ষ্মী মেয়ে। বড় কাজের মেয়ে। ওর হাতে সংসারের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব। বাবা জ্যাঠামশায়কে ধরলে জ্যাঠামশায়ও না বলতে পারতেন না। এই সব শুনে শুনে তারও বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল অচিন্ত্যদার সঙ্গে তার নিশ্চয় বিয়ে হবে। অচিন্ত্যদা কিছু জানতেন কিনা, তা সে জানতে পারে নি। জানলেও তাঁর মনের ভাব কী ছিল তাও সে জানতে পারে নি। তবে তার ভাবী জীবনের সব আশা সব সাধ অচিন্ত্যদাকে জড়িয়ে জড়িয়ে বেড়ে

উঠতে লাগল

একটা দিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ল রাধার। অচিন্ত্যদার পরীক্ষার খবর বেরল। প্রথম বিভাগে পাস করেছেন। দেশের সব ছেলেদের মধ্যে প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান পেয়েছেন, বৃত্তি পাবেন—খবরের কাগজে বেরল। বাবাকে, মাসীমাকে প্রণাম করতে এলেন। মাসীমা ওঁকে রান্নাঘরে বসিয়ে খাবার খেতে দিলেন। তাকে বললেন, বড় ঘামছে অচু! পাখা কর দেখি। সে পাশে দাঁড়িয়ে পাখা করতে লাগল। আর ওঁকে তাকিযে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মনে হল সেদিন, মাসীমাব সাধ মিটবে কি! ওঁকে পাওয়ার সৌভাগ্য তার হবে কি?

মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ বাবা, এব পর কী পড়বে?

অচিন্ত্যদা বললেন, ডাক্তাবী পড়তে বলছেন বাবা।

ওকালতি পড়লেই তো ভাল হত। উকীলের ছেলে—

অচিন্ত্যদা বললেন, বাবার ইচ্ছে নেই। আমারও ডাক্তার হওয়াব ইচ্ছে। মানুষেব সেবা করবাব এমন সুযোগ আব কোন কাজেই পাওয়া যায় না।

মাসীমা বললেন, রাধার পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে—

আমাব দিকে তাকিয়ে বললেন, বন্ধ হবে কেন? অজিত রয়েছে, অপূব বয়েছে, ওদের কাছে পড়বে। আমি বলে দিয়ে যাব ওদের। আমাকে বললেন, মন দিয়ে পড়বি, বুঝলি? আমি পূজোর সময়ে এসে পবীক্ষা করব। পাস করতে না পারলে কানমলা খাবি—

ওঁর ভারী গলার ধ্বনি তার সারা মনে কাঁপতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। বুকটা কাঁপতে লাগল। এমনই হত তার কথা শুনলেই, পড়বার সময়েও। উনি বোঝাতেন, সে তার মুখের পানে তাকিয়ে থাকত; তার কণ্ঠস্বর, তাঁর চোখের দৃষ্টি তার সারা মনকে অবশ করে দিত; কথা কানে ঢুকলেও মনে ঢুকত না। বোঝাবার পরে যখন প্রশ্ন করতেন, কিছুই বলতে পারত না। অচিন্ত্যদা ধমক দিতেন: কিছু হবে না তোর। অত্যন্ত অন্যমনস্ক। সে মাথা

নিচু করে থাকত।

মাসীমা সক্ষোভে বললেন, খুব পড়াবে ওরা! বাড়িতে থাকলে তো! কোথায় কি করে তুজনে জানি না বাবা!

অচিন্ত্যদার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। উনিও সন্দেহ করতে শুরু করেছিলেন—ওরা তুজনে কোন একটা বিপজ্জনক পথে পা দিয়েছে।

বিদেশী শাসকের শাসন-পাশ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সারা দেশ তখন ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। মহাত্মার অহিংস মুক্তি-আন্দোলনে সারা দেশের লোক দলে দলে যোগ দিয়েছিল। দেশবাসীর এই মুক্তি-পিপাসাকে পিষে মারবার জন্য বিদেশী শাসক চণ্ড-নীতি চালিয়েছিল সারা দেশের বুকে। বিদেশী শাসকদের অনুগ্রহজীবী এ দেশের একদল লোক তাদের সাহায্য করছিল। সেই সময়ে বাংলা দেশের এক প্রান্তে একদল তরুণ-তরুণী মুক্তিযজ্ঞ শুরু করল। যজ্ঞাগ্নিতে নিজেদের প্রাণ আহুতি দেবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়ে উঠল। দিলও অনেকে। তাদের জেলাতেও শুরু হল মুক্তিযজ্ঞ। যজ্ঞ-ধূম ছড়িয়ে পড়ল সারা জেলার আকাশে-বাতাসে, সাবা জেলার লোকের মনে। প্রত্যেকটি মানুষেব মনে সমর্থন ছিল এব পিছনে। স্বাভাবিক স্বার্থবুদ্ধির প্ররোচনায় নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনকে দূরে সরিয়ে রাখবার প্রয়াসও ছিল।

ওদের পাড়ার সামনে রাস্তাটার ওপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা মাঠ ছিল। ছোট ছোট কাঁটা-ঝোপে ভর্তি। হলদে রঙের ফুল ফুটত অজস্র। সারা মাঠটা রঙিন হয়ে উঠত। মাঠের মাঝ দিয়ে একটা পায়ে-চলা পথ সরাসরি চলে গিয়েছিল স্টেশনের কাছে রেল-লাইন পর্যন্ত। রেল-লাইন পার হলেই একটা বড় রাস্তা—রেল-স্টেশন থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছিল। এই রাস্তা ধরে মাইলখানেক গেলেই কতকটা দূবে একটা ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপরে একটা ভাঙা বাড়ি ছিল। মুসলমান রাজত্বের সময়ে ওটা নাকি একটা তুর্গ ছিল। পাহাড়ের উপরে জঙ্গল ছিল। গভীর গুহা ছিল অনেক। বাঘ-ভালুকের আড্ডা ছিল নাকি সেখানে।

ভাঙা বাড়িটায় নাকি বড বড় সাপ ছিল। তা ছাড়া লোকে বলত ভূতের আড্ডাও ছিল। দিনের বেলাতেও কেউ ও পাহাড়ের পাশ ঘেঁষত না। শহরের বিপ্লবী তরুণেরা ওইখানেই আড্ডা করেছিল। সেখানে পুলিস হামলা করল একদিন। ধরা পড়ল জনকয়েক।

একদিন দাদাকে আর অপূর্বদাকে পুলিস ধরে নিয়ে গেল। মেরেছিল খুব। ওরা একটা কথারও জবাব দেয় নি। বিচার হল। দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন বিচারক। হাসিমুখে ওরা কারাদণ্ড মাথা পেতে নিল। বাবা ও মাসীমার সঙ্গে সেও জেলখানায় দেখা করতে গিয়েছিল ওদের সঙ্গে। মাসীমা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন ওদের দেখে। সেও কেঁদেছিল। বাবা গম্ভীর হয়ে ছিলেন। ওরা সান্ত্বনা দিল মাসীমাকে। বাবাকে ও মাসীমাকে প্রণাম করল। সে প্রণাম করল ওদের। ওরা মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল তাকে। সুদীর্ঘকালের জন্য যে ওরা তাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাদের মুখ দেখে তাদের ভাবভঙ্গী দেখে বিন্দুমাত্র বোঝা যায় নি। যেন দুদিন পরেই আবার ঘরে ফিরবে এমনই ভাব। বাবা বাড়ি ফেরবার সময়ে বললেন, খোকা যে আমার এতখানি শক্ত হয়ে উঠেছে জানতাম না। ইতিহাসে যে রাজপুত বীরদের বীরত্ব-কাহিনী পড়ে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই তাদের চেয়ে এদের বীরত্ব বিন্দুমাত্র কম নয়।

দাদা জেলে যাবার পরেই বাবা দমে গেলেন খুব। মুখের হাসি নিবে গেল একেবারে। মাসীমাও কান্নাকাটি করতেন প্রায়ই। বীরেনদা প্রায়ই এসে মাসীমার কাছে বসে নানা কথায় ওঁকে ভুলিয়ে রাখত। অপূর্বদাদের বাড়িতেও ওই অবস্থা। পিসীমা ভেঙে পড়লেন একেবার। জ্যাঠামশায় কিন্তু শক্ত রইলেন। দৈনন্দিন কাজ-কর্মে বিন্দুমাত্র শৈথিল্য দেখা গেল না। কথাবার্তায়, আচার-আচরণে বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। অনাদিদা তাদের বাড়িতে আসা বন্ধ করল। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ও আর বেরুত না। পিসীমার কাছে কাছে থাকত।

ছ' মাস পরে দাদার ও অপূর্বদার মৃত্যুর খবর এল। জেলে খুবই অত্যাচার চলত ওদের ওপর। ওরা বিদ্রোহ করেছিল। কর্তাদের আদেশে জেলের প্রহরীরা গুলী চালিয়েছিল। কয়েকজন আহত হয়েছিল। তিনজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল—অপূর্বদা, দাদা আর একজন ছেলে।

একমাত্র পুত্রের এই শোচনীয় মৃত্যুর আঘাত বাবা সহ্য করতে পারেন নি। বাবার রক্তের চাপ এমনই বেশী ছিল; হঠাৎ মূর্ছিত হয়ে পড়লেন একদিন। সারা বাম অঙ্গ অসাড় হয়ে গেল। স্কুলের চাকুরি গেল, প্রভিডেণ্ড-ফণ্ডের কিছু টাকা পাওয়া গেল। চিকিৎসাতে তার অর্ধেক খরচ হয়ে গেল। বাকী টাকায় কিছুদিন চলল। বোস জ্যাঠামশায় সাহায্য না করলে তাদের অনাহারে মরতে হত। বাবার অসুখের সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি ভাড়া নেওয়া বন্ধ করেছিলেন। তা ছাড়া রোজ দু' টাকা করে দিতেন। তাতেই মাসীমা কোন রকমে সব খরচ চালাতেন।

বাবা অসুখে পড়ার কিছুদিন পরেই সরকার থেকে রামজীবন জ্যাঠামশায়ের ওপর শহর থেকে চলে যাওয়ার আদেশ জারি হল। ওঁরা সবাই কলকাতা চলে গেলেন। জ্যাঠামশায় আলিপুরে প্র্যাকটিশ করতে লাগলেন।

মাসীমা হঠাৎ অসুখে পড়লেন। দুটি রোগীর সেবা, সংসারের সব কাজ তার ঘাড়ে পড়ল। এ সময় বীরেনদা খুব সাহায্য করল। মাসীমার চিকিৎসা ও সেবার ভার সে সম্পূর্ণরূপে নিজের হাতে নিল। মাসীমাকে সে নিজের মাসীর মত ভালবাসত। সে-সময় দিনরাত সে তাদের বাড়িতে মাসীমার বিছানার পাশটিতে বসে থাকত। সে মাসীমার কাছে গেলেই তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত। সেই দৃষ্টি যেন প্রদীপশিখার মত সহস্র কর দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরত। তার দিকে না তাকিয়েও তার দৃষ্টির স্পর্শ সর্বাঙ্গে সে অনুভব করত। একবার চোখ তুললেই চোখে চোখ মিলত; সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠত, ভাবনা-চিন্তা গুলিয়ে যেত। ওর চোখের

সম্মোহনী শক্তি তার চোখকে টেনে ধরে রাখত, চেষ্টা করেও সে চোখ ফেরাতে পারত না। তখনই সে বুঝতে পেরেছিল যে, সে তার ওই দুটি চোখের দৃষ্টি-রশ্মি দিয়ে তাকে যেখানে ইচ্ছে টেনে নিয়ে যেতে পারে—তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করাতে পারে।

একদিনের কথা মনে পড়ল রাধার। রোজ সন্ধ্যেব পর তাকে বোস জ্যাঠামশায়ের কাছে যেতে হত। উনি আদালত থেকে ফিরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে, চা-খাবার খেয়ে বেড়াতে বেরতেন। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরতেন, তারপর বৈঠকখানায় বসতেন। সেই সময়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁব সাহায্যেব টাকা নিয়ে আসতে হত। একদিন জ্যাঠামশায় কি একটা কাজে বেবিয়ে গিয়েছিলেন। ওঁব মুহুরী বলল, ফিরতে অনেক রাত হয়ে যাবে।

ফিবে আসবাব সময় বীবেনদার সঙ্গে দেখা হল। জিজ্ঞাসা করল, বাবার সঙ্গে দেখা হল?

সে ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

তবে? টাকা না নিয়েই ফিবে যাচ্ছ?

সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বীবেনদা বলল, মাযের কাছে যাও নি?

সে ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

বীবেনদা বলল, আচ্ছা, এস আমাব সঙ্গে, আমি দেব।

সে বলল, আমি এখন যাই। কাল সকালে এসে নিয়ে যাব।

বীরেনদা বলল, কেন? আমার টাকা নিতে দোষ আছে নাকি?

চুপ কবে মাথা নিচু কবে দাঁড়িয়ে রইল সে।

বীবেনদা ধারাল স্ববে বলল, আসবে না?

সে বলল, না, যাই। মাসীমা একা আছেন।

বীরেনদা শ্লেষাক্ত স্ববে বলল, আসতে ভয হচ্ছে বুঝি?

মুখে এল ওর: ভয় কি অন্যায়? কিন্তু চেপে গেল।

আর একটি দিনের ঘটনার কথা মনে পড়ল তার। দীপালির বাত্রি। মিনুদের ছাতে আলো সাজাচ্ছে বীবেনদা আর মিনু। সেও আছে

সঙ্গে। বীরেনদা এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ওকে ওর ভাই বোন পাত্তা দিচ্ছে না। দু-একবার চেষ্টা করেছিল; মিনু ঝাঁজিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে: বড়দা, তুমি আর হাত চালিয়ো না দেখি। কিছু পার না। উল্টে আমাদের সাজানো নষ্ট করে দিচ্ছ। বীরেনদা মুখ কাঁচুমাচু করে সরে দাঁড়াল। এক পাশে সরে গিয়ে দূরে আলোকমালায় সজ্জিত একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে রইল।

মা নেই বেচারার! কেউ ভালবাসে না ওকে! ভাবতেই তার ভারী মায়া হল ওর ওপরে। সত্যি, ভারী দুষ্টু হয়ে উঠেছিল সে! কিছু কিছু রোজগার করতে শুরু করেছিল। জ্যাঠামশায়কে এক পয়সা দিত না। নানা বাজে খরচ করে উড়িয়ে দিত। নানা দোষেও ধরেছিল নাকি এর মধ্যে—মিনু বলত। মিনুর সঙ্গে বা জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হলেই বীরেনদার নানা কুকর্ম সম্বন্ধে এক প্রস্থ গৌরচন্দ্রিকা শেষ হবার পর, তবে আসল কথাবার্তা আরম্ভ হত। তবু মনে হল, ও যত মন্দই হোক, ওর মা থাকলে কি এমন করে ওকে দূরে সরিয়ে দিতে পারতেন!

সুপ্রশস্ত ছাত। ধীরেনদা আর মিনু এক দিকে সরে গিয়েছিল। সেও নিজের মনে সাজাচ্ছিল। খেয়াল ছিল না কিছুই। হঠাৎ বীরেনদার ডাক শুনতে পেল: রাধা! চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখল, বীরেনদা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকারে ওর চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলছে। ভয়ে বুক শুকিয়ে উঠল তার। গলা শুকিয়ে গেল। কোনমতে বলল, কেন?

হঠাৎ একেবারে কাছে এসে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরল বীরেনদা। তার পরই দ্রুতপদে ছাত থেকে নিচে নেমে গেল।

সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল তার ব্যবহারে। মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। সারা দেহ থরথর করে কাঁপছিল। বসে পড়ে দু হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল অনেকক্ষণ। মিনু কাছে এসে সোদ্বেগে বলে উঠল, কী হল রে তোর?

সে বলল, মাথাটা ঘুরছে ভাই। আজ উপোস করে আছি কি না!

বড়দা কোথায় গেল?

চলে গেছেন।

মিনু পরদিন তাদের বাড়ি এসেছিল। এমনিতেই খুব কম আসত। জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁরে, দাদা কাল তোর সঙ্গে কি কিছু খারাপ ব্যবহার করেছিল? সে বিস্ময়ের ভান করে বলল, না তো! মিনু যে তার কথা বিশ্বাস করল না মোটেই, ওর মুখ-চোখ দেখেই বোঝা গেল। বলল, ওর কাছে বেশী যাস নে। ও বয়ে যাচ্ছে দিন-দিন।

* * *

বীরেনদা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। বলল, এইখানেই দাঁড়াও। আমি টাকা আনছি। বলে বাড়ির দিকে চলে গেল।

সে ওর জন্য অপেক্ষা করে নি। বাড়ি চলে এসেছিল। একটু পরেই বীরেনদা টাকা এনে পৌঁছে দিল মাসীমার হাতে। তাকে বলল, টাকাটা নিয়ে এলে না?

সে মুখ নামিয়ে সরে এসেছিল।

আরও বৎসর খানেক ভুগে বাবা মারা গেলেন। বোস জ্যাঠামশায় সব ব্যবস্থা করলেন! তিনি যা করেছিলেন তাদের জন্য, নিজের পরম আত্মীয়রাও তা করে না।

জ্যাঠামশায় ওদের এক সরকারকে দিয়ে তাদের তার মামার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

ওখান থেকে চলে আসবার আগের দিন ওরা জ্যাঠামশায়দের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল। জ্যাঠাইমার ঘরে গিয়ে বসল তারা। জ্যাঠাইমা মাদুর পেতে বসালেন তাদের। তার কাছে বসে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগলেন। দুজনই কাঁদছিলেন। এই শেষ দেখা। অনেক করেছেন ওঁরা। কে আর এমন করে করবে! কে দেখবে মেয়েটাকে! কী হবে ওর! মামার বাড়িতে মামা নেই। মারা গেছেন অনেক দিন আগে! বুড়ো দাদামশায় আছেন, কদিনই বা

বাঁচবেন আর! কী করে বিয়ে হবে ওই মেয়ের! কে দেখেশুনে বিয়ে দেবে! এই সব বলে মাসীমা একটু চুপ করে থেকে বললেন, যা সাধ ছিল মনে মিটল কই!

জ্যাঠাইমা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন মাসীমার দিকে। মাসীমা বললেন, অচিন্ত্যর সঙ্গে বিয়ে দেব ভেবেছিলাম। হয়েও যেত। ভগবান সব দিক দিয়েই মারলেন যে! ওরা দেশ ছেড়ে কোথায় চলে গেল—

জ্যাঠাইমা বললেন, ভগবানের ওপর নির্ভর করুন দিদি। তিনিই ব্যবস্থা করবেন। যাদের কেউ দেখবার নেই, তিনিই দেখেন তাদের।

মিনু ডাকল তাকে, ওর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। তারপর তার কাছ ঘেঁষে বসে বলল, হ্যাঁরে, ভুলে যাবি না তো? সে বলল, দুঃখের দিনে সুখের দিনের কথা কেউ ভোলে কি? দুঃখের দিনে সুখের দিনের স্মৃতিই তো একমাত্র আশ্রয়। আগুনের আঁচে ঝলসানো মন এক-একবার সুখ-স্মৃতির আড়ালে গিয়ে ঠাণ্ডা হয়। তুই-ই ভুলে যাবি ভাই! ভগবানের কৃপায় আরও সুখের দিন আসবে তোর জীবনে। তখন এই হতভাগী মেয়েটার কথা তোর মনে পড়বে না। দৈবাৎ যদি কখনও দেখা হয়ে যায়, চিনতে পারবি না· -

* * *

মেয়েটির মুখে একটি ক্ষীণ হাসি একবার ফুটে উঠেই সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল। তার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল তার জীবনে। কলকাতায় গঙ্গার ঘাটে মিনুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল একবার। মিনু চিনতে পারে নি।

* * *

মিনু তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, কখনও ভুলব না তোকে। তুই চিঠি দিবি। আমিও দেব। তা হলেই আমাদের বন্ধুত্ব ঠিক টিকে থাকবে দেখবি।

দিনকতক চিঠি চলাচল হয়েছিল দুজনের মধ্যে। তারপর কখন বন্ধ হয়ে গেল।

মামারবাড়িতে এল তারা। মামা মারা গিয়েছিলেন অনেকদিন আগে। ছিলেন মামীমা, মামাতো বোন চন্দ্রা আর দাদু। দাদু এ তল্লাটের বৈষ্ণব সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের একজন ছিলেন। নাম প্রেমদাস বাবাজী। চমৎকার কীর্তন গাইতে পারতেন। বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

ছোট গ্রাম। গ্রামের নাম কাঁচামাটি। কয়েক ঘর বৈষ্ণবের বাস। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ এবং অন্যান্য জাতিরও বাস আছে কয়েক ঘর করে। মাইল দুই-তিন দূরে রেল-স্টেশন। স্টেশনটার অপর দিকে একটা বাজার। সেখানে বড় বড় দোকান আছে। ধান-চালের আড়ত আছে। তার পরেই একটা বড় গ্রাম—নাম বলরামপুর। অনেক অবস্থাপন্ন লোকের বাস। ওই গ্রামের নামেই স্টেশনের নাম।

কান্নাকাটির পালা শেষ হল। নতুন জীবনে নিজেকে মানিয়ে নেবার চেষ্টা শুরু হল তারপর। দাদু বললেন, লেখাপড়া করে কাজ নেই। সংসারের কাজকর্ম কর, গৌরাঙ্গদেবের সেবা-আয়োজন করতে শেখ, কীর্তন গাইতে শেখ, বৈষ্ণব মেয়েদের যা সব কাজ—

মামারবাড়ির সামনেই গৌরাঙ্গদেবের মন্দির। মন্দিরের মধ্যে পাথরের তৈরি সিংহাসনে শ্বেত পাথরের তৈরি শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্তি। দাদুই পূজো করতেন রোজ দু বেলা। চন্দ্রাই পূজোর সব আয়োজন করত। চন্দ্রার কাছে সে সব শিখে নিতে লাগল।

রোজ সন্ধ্যের পর কীর্তন হত। পাড়ার প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা নিত্যনিয়মিত ভাবে আসত। দু-একজন যুবকও আসত।

প্রায়ই যে আসত তার নাম রতন। ওর ওখানে বাড়ি ছিল না। পিসীমার বাড়িতে থাকত। কিছুটা দূরেই বাড়ি ছিল। ওর মা ছিলেন মামীমার সই। মামীমা খুব স্নেহ করতেন ওকে। চন্দ্রার সঙ্গে ওর বিয়ে স্থির হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির ভিতরে ওর অবাধ যাওয়া-আসা ছিল। ভাবী জামাই—খাতিরও ছিল খুব। এলেই মামীমা সাদরে বসাতেন, চা-খাবার খাওয়াতেন। প্রথম দিন দেখা

হতেই তার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল ; বলল, আপনি ইংরেজী পড়া মেয়ে—মেমসাহেব ! পাড়াগাঁ কি আপনার ভাল লাগবে ? সে জবাব দেয় নি। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তাকে।

কালো, মোটাসোটা দেহ, চাকার মত গোল মুখ। দাড়ি-গোঁফ কামানো। মাথায় লম্বা চুলে বাহারে টেড়ি। পরনে ধুতি শার্ট। ধুতি বেশ কায়দা করে পরা, শার্টটাও যথাসম্ভব শহুরে যুবকদের ধাঁচে পরা। স্টেশনের বাজারে চালের আড়তে কাজ করত। রতন বলল, কী দেখছেন ? চাষাভূষো অসভ্য লোক, জাতবৈষ্ণব, ভিখিরী। সে বলেছিল, দেখে তো মনে হচ্ছে না। রতন হেসে বলল, মনে হচ্ছে না ! কী মনে হচ্ছে ?

সে বলল, শহুরে শহুরে—

রতন পরম আত্মপ্রসাদে মুখ-চোখ ঘুরিয়ে বলল, তা তো হবেই। শহরের লোকের সঙ্গে হরদম ওঠা-বসা তো ! আমাদের আড়তদার খাস শহরের লোক—

আর একজন আসত। গৌরদাস। পাতলা ছিপছিপে লম্বা, ফরসা রঙ। মুখের চেহারা মন্দ নয়। গোঁফদাড়ি ওঠে নি বেশী। মুখের ভাব মেয়েলী ধরনের। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে খাটো ধুতি, গায়ে চাদর। দাদুর বন্ধুর ছেলে। দাদুর বাড়িতে থেকে গাঁয়ের বামুনপাড়ার টোলে সংস্কৃত পড়ত। আর দাদুর কাছে বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ করত, কীর্তন শিখত। ওর বাবা মারা যাবার পর ওকে বাড়িতে গিয়ে বাবার সব কাজের ভার নিতে হল। ওর গলা ছিল চমৎকার। কীর্তন গাইত খুব ভাল।

এক-একদিন গৌরদাসের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চন্দ্রাও কীর্তন গাইত। সুর-সঙ্গতি ঘটত চমৎকার। মনে হত ওদের দুটি জীবনের সুর যদি মেলে, এমনই মাধুর্যের সৃষ্টি হবে।

মামীমাকে তার মাসীমা বলেছিলেন একদিন, ওদের দুজনের যখন এত মিল, বিয়ে দিচ্ছ না কেন ওর সঙ্গে ?

মামীমা বললেন, কী যে বল ঠাকুরঝি ! কিছু নেই ওদের।

গাঁয়ের জমিদারের দেওয়া বিঘে কয়েক দেবোত্তর জমি সম্বল। ঘর-দোর বলতে তেমন কিছু নেই। রতন লেখাপড়া যদিও কিছু জানে না, কিন্তু অবস্থা ভাল। বাজারে চাকরি করে বেশ দু পয়সা রোজগার করে।

মাসীমা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, রাধাকে যে কার হাতে দিই—

মামীমা বললেন, কার সঙ্গে কথাবার্তা চলছিল শুনেছিলাম যে—

মাসীমা বললেন, সে সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে ভাই! তাদেরও আমাদের মত বিপদ। বাড়ির এক ছেলে জেলে মারা গেছে। শহর থেকে সরকার তাড়িয়ে দিয়েছে, কলকাতায় আছে। এই পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে তাদের খবর পাবই বা কী করে, তাদের খবর দেবই বা কী করে?

সে বছর রাস-পূর্ণিমার দিন গৌরদাস এল। কীর্তন গাইল সারারাত্রি ধরে। সারা পাড়ার লোক কীর্তন শুনতে এসেছিল। গৌরাঙ্গদেবের পূজো ও ভোগ হল। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করল রতন—এর মধ্যেই পাড়ার একজন মাতব্বর হয়ে উঠেছিল সে। পাড়ার অন্য সবাই সামান্য চাষ-বাস করে, কেউ বা ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করত। পাড়ার মধ্যে সে-ই শুধু নগদ টাকা রোজগার করে ঘরে আনত। সেই কারণে বতনের পিসীরও মর্যাদা সবচেয়ে উঁচু হয়ে উঠেছিল। কীর্তনের সময়ে মেয়েদের সর্বাগ্রে স্থান ছিল তার।

সকলেই কীর্তন শুনে ধন্য-ধন্য করতে লাগল। বয়স্ক লোকেরা বলতে লাগল, হবে না কেন? কার নাতি! হরিদাস বাবাজী ছিলেন নাম-করা কীর্তনীয়া। এ দেশে বাড়ি ছিল না। কোন এক কীর্তনের দলের সঙ্গে গাঁয়ের জমিদারের বাড়িতে এসেছিলেন। ভক্ত লোক ছিলেন জমিদারবাবু; কীর্তন শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। ওঁকে আর ছাড়তে চাইলেন না। রাধা-মাধব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে, দেবোত্তর দিয়ে, ওঁর ওপর পূজোর ভার দিয়ে, ওঁকে ধরে রাখলেন।

দাদুর মাঝে মাঝে ভাবাবেশ হতে লাগল। অনেকের চোখ থেকেই জল পড়তে লাগল। সত্যি চমৎকার গাইছিল। যেমন মধুর কণ্ঠস্বর,

তেমনই দরদ। চোখ দুটি বুজে দুলে দুলে গান গাইছিল—

এ সখি আমার দুখের নাহি ওর,

এ ভরা ভাদর মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর—

একটি অপার্থিব আলোয় মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দেখতে ভাল লাগছিল তার। শুনতেও ভাল লাগছিল। সকলের সঙ্গে সারারাত্রি ধরে কীর্তন শুনেছিল।

পরদিনও গৌরদাস রইল। দাদু মাসীমার কাছে কথাটা পাড়লেন : বৃন্দে! গৌরের হাতেই রাধাকে দে। যার হাতে দিবি ভেবেছিলি সে তো নাগালের বাইরে। বামন হয়ে চাঁদ ধরবার আশা না করাই ভাল। মেয়েটার বয়স বাড়ছে দিন দিন। আর কত দিন বসিয়ে রাখবি। আমার বয়স হয়েছে, শরীরও ভাল নেই। এখানের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে! যাবার আগে রাধা আর চন্দ্রার বিয়ে দেখে যেতে চাই।

মাসীমা বললেন, ওর এখন থাক বাবা। চন্দ্রার বিয়ে তুমি দাও।

দাদু বললেন, তা কি হয়! বড় থাকতে ছোটর বিয়ে হলে লোকে নিন্দে করবে। গৌর গরীব বলে ভাবছিস! ওর ধন-দৌলত নেই, কিন্তু অন্তরে যে রত্ন আছে, রাজার রাজত্ব দিলেও তা মিলবে না। দে তুই রাধাকে ওর হাতে। ওকে জানি ছেলেবেলা থেকে। আমাদের সমাজের রত্ন ও। রাধার সঙ্গে মানাবেও। মনেরও মিল হবে। সুখী হবে ওরা।

মাসীমা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। গৌরদাসকে তার ভাল লেগেছিল। নিরীহ গোবেচারী মানুষ, সাধু প্রকৃতি। কোন দিন কোন অন্যায় করবে না, অনাচার অত্যাচার করবে না। যে সাধ তার মনে জেগেছিল একদিন, তা বামনের চাঁদ ধরার সাধ! যে স্বপ্ন সে দেখেছিল এক দিন, তা পঙ্কের তিলক হবার স্বপ্ন! এ সাধ এ জীবনে মিটবে না কোন দিনই, এ স্বপ্ন সফল হবে না কোন দিনই। পিতৃমাতৃহীনা মেয়ে সে, মাসীমা ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নেই। মাসীমা যাবার পরে পৃথিবীতে দাঁড়াবার স্থান থাকবে না। দেখবার শোনবার কেউ থাকবে না। বেশী আশা করা তার মত মেয়ের শোভা পায় না। দু বেলা দু মুঠো ভাত, মাথার ওপরে যেমন-তেমন হোক একটা আশ্রয়, গায়ে যা-তা হোক একটা আচ্ছাদন—এই তো তার পক্ষে যথেষ্ট। গৌরদাসের সঙ্গে বিয়ে হলে তা বোধ হয় তার জুটবে।

সে বিয়েতে মত দিয়েছিল।

বিয়ের কথাবার্তা স্থির হল অগ্রহায়ণ মাসে। বিয়ে হল মাঘ মাসে। শ্বশুর বাড়ি এল—মামার বাড়ি থেকে মাইল ছয় দূরে। গৌরদাসের মা ছিল না। সংসারে অন্য কোন মেয়েমানুষ ছিল না। এসেই সংসার ঘাড়ে পড়ল। মাসীমার জন্য মন কেমন করত, সংসারের কাজে মনটা ডুবিয়ে দিয়ে ভোলবার চেষ্টা করত।

বৈশাখ মাসে চন্দ্রার বিয়ে হল। গৌরদাসের সঙ্গে সে বিয়েতে যোগ দিয়েছিল। বিয়েতে বর-কনে দুজনের মুখেই হাসি দেখে নি কেউ।

* * *

মদন ফিরে এল। ডাক দিল, দিদি!

চিন্তাজাল-বয়নে ছেদ পড়ল।

রাধা বলল, ফিরে এলি? দেখা পেয়েছিস?

মদন বলল, হ্যাঁ দিদি।

কী করছে?

রান্না করছে।

ছেলেটিকে দেখলি?—জিজ্ঞেস করল রাধা। মদন বলল, ওকে দেখলাম না। কোথাও গেছে হয়তো। একটু চুপ করে থেকে বলল, সন্ধ্যের পর রোজই বাড়িতে থাকে।

মদন চলে গেল বাড়ির ভিতরে।

আবার জাল বোনা শুরু করল মন।

তার শ্বশুরবাড়ির গ্রামটিও খুব বড় নয়। নাম—সিন্দুরহাটি। এক পাশে একটা বড় নদী। আর এক পাশে মাঠের পর মাঠ। ব্রাহ্মণপাড়া ছিল একটা। বিশ-ত্রিশ ঘর ব্রাহ্মণের বাস ছিল : গ্রামের জমিদার ছিলেন ব্রাহ্মণ। গ্রামের একপ্রান্তে ছিল চাষী-কৈবর্তের পাড়া। তারই একপাশে বৈষ্ণবপাড়া। মাত্র কয়েক ঘর বৈষ্ণব ছিল পাড়াটায়। গৌরদাসের ঠাকুরদার এখানে বাড়ি ছিল না। গ্রামের জমিদার তাঁকে রাধা-মাধবের সেবাইত করে গ্রামে বসিয়েছিলেন। গ্রামের ব্রাহ্মণেরা আপত্তি জানিয়েছিল। তিনি কারও কথায় কান দেন নি।

মাটির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা। পূব দিক ঘেঁষে রাধা-মাধবের মন্দির। সামনে আটচালা। পশ্চিম দিকে ঘেঁষে দুটি খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর। এক পাশে ছোট মাটির রান্নাঘর ; তারই পাশে একটা চালায় গোয়াল ঘর। সামনের কতকটা জায়গা, বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা—তরিতরকারির বাগান। বর্ষায় লাউ কুমড়ো ঝিঙে শশার গাছ লতিয়ে লতিয়ে সারা জায়গাটা ছেয়ে ফেলত। অপরাহ্নে ঝিঙে গাছগুলোতে অজস্র হলুদ রঙের ফুল ফুটে বাগানটা ঝলমল করত। চাঁপা করবী জুঁই টগর বেলা শিউলি সন্ধ্যামণি ইত্যাদি নানা ফুলের গাছও ছিল। চাঁপা ও করবী ফুটত বসন্তে। গ্রীষ্মে ফুটত অজস্র বেলা ও জুঁই ফুল। বর্ষায় দোপাটি সন্ধ্যামণির গাছগুলো ফুলে লাল হয়ে উঠত। শরতে টগর ও শিউলি গাছগুলো রাশি রাশি ফুলে দুধের মত সাদা হয়ে উঠত। ফুলের গন্ধে ঘরের বাতাস ভারী হয়ে উঠত।

শীতে ফুটতে গাঁদা গাছগুলোর অজস্র গাঁদা ফুল। বাড়ির পিছনের খিড়কির সামনেই একটা বাগান ছিল—জমিদারের! আম জাম নারকেল গাছ ছিল অনেক। বাগানের মাঝখানে একটা পুকুর ছিল। শালুক আর পদ্মপাতায় ঢাকা ছিল জলের উপরটা। পুকুরে পাড়ার মেয়েরা স্নান করত। খিড়কির দরজা দিয়ে গিয়ে সেও সেখানে স্নান করে আসত।

রাধা-মাধবের নামে কয়েক বিঘা জমি ছিল। ভাগে চাষ হত। চাষী-কৈবর্তদের একজন চাষ করত। উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক স্বামীর ঘরে উঠত। তাতেই সারা বছর দেব-সেবা চলে যেত। স্বামী-স্ত্রী দুজনের দু বেলা খাওয়া চলত। সংসারে তো আরও অনেক খরচ ছিল। বিশেষ করে ধুতি-শাড়ি কেনা। স্বামীর বছরে একজোড়া ধুতি আর একখানা চাদর হলেই চলে যেত। কিন্তু তার তো তাতে চলত না। স্বামীকে একটা পাঠশালা খোলবার পরামর্শ দিল। চাষী-কৈবর্তদের পাড়ার মোড়লদের সঙ্গে কথা বলতেই তারা রাজী হল। পাঠশালা খোলা হল শুভদিন দেখে। দশ-বারটি মাত্র ছেলে হল। আটচালায় পড়ানোর ব্যবস্থা। সকালে ও বিকেলে পাঠশালা বসত। রাধা-মাধবের পূজা-অর্চনা সেরে এবং বিকেলে খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে স্বামী পড়াতে বসত। ছেলেরা কেউ দু আনা কেউ চার আনা মাইনে দিত। যা হোক এতেই কিছু আয় বাড়ল। স্বামী তার বুদ্ধির প্রশংসা করল: খুব বুদ্ধি তোমার! শহরে লেখাপড়া জানা মেয়ে তো! আমার মাথায় এ বুদ্ধিটা আসে নি। সে ঠাট্টা করে বলে ছিল, মাথা তোমার নিজের থাকলে তো বুদ্ধি আসবে। রাধা-মাধবের পায়ে মাথা বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে যে!—অপরূপ হাসি ফুটে উঠল স্বামীর মুখে: ঠিক বলেছ। তাঁর পায়েই মাথা রেখে যেন যেতে পারি।

কোন কোন দিন সংসারের কাজ-কর্ম শেষ করে সেও স্বামীর সহকারিণীর কাজ করত। ছেলেরা তাদের নিরীহ শিক্ষকটিকে তত আমল দিত না। কিন্তু তাকে ভয় ও শ্রদ্ধা করত। স্বামীর হাঁক-ডাকে যা-না কাজ হত, তার সামান্য ভ্রূভঙ্গে তার চেয়ে বেশী কাজ হত।

দিনগুলি আনন্দেই কাটত। স্বামী খুব ভোরে উঠত। মন্দির-মার্জনা করত নিজের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে মধুর কণ্ঠে প্রভাতী কীর্তন গাইত—"রাই জাগো, রাই জাগো সারি শুক বলে, কত নিদ্রা যাও কাল মানিকের কোলে"—ভোরের আধো নিদ্রা আধো জাগরণের

মধ্যে সেই গান শুনতে ভারি ভালো লাগত। মন্দির-মার্জনা শেষ করে স্বামী নদীতে স্নান করতে যেত। যাবার আগে তাকে ডাক দিয়ে বলত, রাধে! ওঠ, আমি চললাম। মাইল খানেক দূরে নদী। স্নান সেরে ফিরতে বেলা হয়ে যেত। সে ইতিমধ্যে ঘরের কাজ শেষ করত। মঙ্গলী গাইকে গোয়াল থেকে বার করে গোয়াল পরিষ্কার করত। তারপর বাগানের পুকুরে স্নান করে এসে সাজি ভরে ফুল তুলে আনত, মালা গেঁথে রাখত। পাঠশালার ছেলেরা এসে পড়ত এর মধ্যেই। সে তাদের পড়াশুনা আরম্ভ করিয়ে দিত। স্বামী স্নান সেরে স্তব আবৃত্তি করতে করতে বাড়ি ফিরত। স্বামীর কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য সে সমস্ত কাজের মধ্যেও কান পেতে রাখত। শুনবামাত্র স্বামীর তসরের ধুতি ও চাদর মন্দিরের সামনে বাঁধানো তুলসী-মঞ্চের উপর নামিয়ে রাখত। স্বামী এসে মন্দির প্রদক্ষিণ ও রাধা-মাধবকে প্রণাম সেরে তুলসীমূলে প্রণাম করত। তারপর কাপড় ও চাদর পরে পূজোর জন্য প্রস্তুত হত। পূজোর সময়েও রাধা পাশেই থাকত। পূজা-উপচারগুলি স্বামীর হাতের কাছে এগিয়ে দিত আর মাঝে মাঝে এসে পাঠশালার ছেলেদের তদারক করত। পূজো শেষ হবার মুখেই ঘরে গিয়ে স্বামীর জন্য জলখাবার সাজিয়ে রাখত। গরীবের অতি সামান্য খাবার—এক মুঠো মুড়ি বা মুড়কি। তার সঙ্গে থাকত প্রসাদী একটু কিছু। তাই স্বামী পরম আনন্দে খেত। তারপর এক কুচি সুপুরি চিবোতে চিবোতে পাঠশালায় গিয়ে বসত।

পাঠশালার কাজ শেষ করে স্বামী যখন ঘরে ফিরত, তখন তার রান্না প্রায় শেষ হয়ে আসত। স্বামী দূর থেকেই ডাক দিত—রাধে! সে সাড়া দিত না। উনুনের সামনে চুপ করে বসে থেকে মৃদু মৃদু হাসত। ডাকের পর ডাক পড়ত। খাঁটি ভালবাসার সুর বাজত সেই ডাকে। শুনতে ভারী ভাল লাগত। বারবার শুনতে ইচ্ছে করত। তাই সাড়া দিত না।

রান্নাঘরের সামনে এসে স্বামী বলত, রাধে, রান্না হল? উনুনের আঁচটা থেকে সরে বস, মুখখানা লাল হয়ে গেল যে।

রাধা মুখ ফিরিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। লম্বা, ছিপছিপে চেহারা ; বালকের মত সরল, সুন্দর মুখ ; পরনে তারই হাতে ক্ষারে-কাচা ধবধবে পরিষ্কার কাপড়, গায়ে চাদর। পাতলা চাদরের ভিতর দিয়ে গায়ের রঙ ফেটে পড়ত। হঠাৎ অচিন্ত্যদার চেহারা ভেসে উঠত চোখের সামনে।

সরস্বতী পূজো হত তাদের বাড়িতে। অচিন্ত্যদা, অপূর্বদা, অনাদিদা আর দাদা এই চারজনে চাঁদা দিয়ে পূজো করত। পূজোর দিন সবাই উপোস করে থাকত। সকাল সকাল স্নান করে সবাই পূজো-মণ্ডপে জড়ো হত। অচিন্ত্যদা আসত সাদা গরদের ধুতি চাদর পরে। সে পূজোপকরণ সাজাতে সাজাতে সবার অলক্ষ্যে এক এক বার তাকিয়ে দেখত—এমনই দেখাত তাঁকে। মনে হত কোন দেবতা মানবরূপ পরিগ্রহ করে দেখা দিয়েছেন !

স্বামীকে আড়াল করে, এই চেহারাটাই ভেসে উঠত প্রতিদিন। দেখতে না দেখতে আবার মিলিয়ে যেত। একদিন স্বামী হেসে জিজ্ঞাসা করল, কী এত দেখ এমন করে ?—সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সবলে দীর্ঘনিশ্বাস চেপে কোন মতে বলে ফেলল, কিছু না। একটু স্থির হয়ে বলল, যাও, চাদরটা ছেড়ে এসে খেতে বস। আমার রান্না হয়ে গেছে।

অনতিবিলম্বে স্বামী ফিরে এসে একটা আসন টেনে নিয়ে বসল। তাকে খেতে দিয়ে পাখার বাতাস করতে করতে সে বলল, রোজ এমন করে কী দেখি, তুমি জিজ্ঞেস করছিলে তখন ?

স্বামী মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, করছিলাম তো। প্রত্যেকদিন প্রশ্নটা মনে আসে, আজ বলে ফেললাম।

সে মুখ টিপে হেসে বলল, তোমাকে রোজ দেখি আর ভাবি, কার জিনিস কে ভোগ করছে ! চন্দ্রার জিনিস, আমি ভোগ করছি—বেচারার মুখের হাসি চিরদিনের মত মিলিয়ে গেছে।

স্বামী মৃদু হেসে শান্ত কণ্ঠে বলল, ওদের বাড়িতে অনেকদিন ছিলাম, ছেলেবেলা থেকে দেখেছে আমাকে। নিজের বোনের মত ভালবাসে—

সে বলল, আমার তা মনে হয় না। তোমাকেই ও ভালবাসে। তোমাকেই মন প্রাণ দিয়ে চেয়েছিল ও। রতনকে চায় নি। রতনকে ও ভালবাসে না। দেখেছি তো নিজের চোখে, তুমি যখন ওখানে যেতে, ওর আনন্দ যেন মনে ধরত না, উপচে উপচে পড়ত। সব সময় তোমাকে চোখে চোখে রাখত যেন কোন অসুবিধে না হয় তোমার। যতক্ষণ থাকতে ওখানে, তোমার কাছ ছাড়া হতে চাইত না। অথচ রতন বাড়িতে এলে ও সেদিকে ঘেঁষত না। মামীমা অনুযোগ করতেন, দু দিন পরে যার গলায় মালা দিবি, তাকে ভাল করে দেখিস না, কেমন ধারা ব্যবহার তোর ?

স্বামী বলল, না না, তা নয়। তুমি ভুল বুঝেছ। বড় মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে চন্দ্রা, সকলকেই ও ভালবাসে। রতন যেন একটু কী রকম ধরনের ! বৈষ্ণবের মত আচার আচরণ তো নয় ! প্রেমদাস বাবাজীর মত পরম বৈষ্ণবের কাছে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে যে মেয়ে মানুষ হয়েছে, রতনের মত লোককে তার ভাল লাগবার কথা নয়। তবু ওর স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতার জন্যই ও রতনকে এক দিন ভালবাসবেই।

দুপুরে খাওয়ার পর গৌরদাস তার বাবার আমলের ধর্মগ্রন্থগুলি পাঠ করত। কোন দিন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, কোন দিন গোবিন্দদাসের কড়চা, কোন দিন বা পদকর্তাদের পদাবলী। সে পাশে বসে শুনত, সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ চলতে থাকত। ছেঁড়া কাপড় সেলাই করত ; কিংবা পাড়ের রঙিন সুতো দিয়ে কাঁথা সেলাই করত। তারপর ছেলেরা এসে পড়ত। গৌরদাস গ্রন্থগুলো তুলে রেখে পাঠশালায় যেত।

সন্ধ্যায় পূজারতির পর আটচালায় কীর্তন হত রোজ। পাড়ার জনকয়েক নিয়মিতভাবে যোগ দিত। গৌরদাস কীর্তন গাইত। পাড়ার দুজন খোল-করতালে সঙ্গত করত। বাকী লোকগুলি দোহারী করত। রান্নাঘরে বসে রান্না করতে করতে সে গান শুনত। রান্নাঘরের কাজ শেষ করে সে মন্দিরের চাতালের এক পাশে বসে গান শুনত। সে যাবার পর গৌরদাস আরও মেতে উঠত ; আখরের পর আখর দিয়ে গানের প্রত্যেকটি চরণ নিংড়ে নিংড়ে রসের

শেষ কণাটুকু পর্যন্ত বার করত।

রাত্রি গভীর হয়ে উঠত। পাড়ার প্রাণ-স্পন্দন স্তিমিত হয়ে আসত। যে তারা সন্ধ্যায় দিগন্ত-লগ্ন ছিল, তাই মধ্যাকাশে এসে জ্বলজ্বল করত। কীর্তন শেষ হত। পাড়ার লোকেরা রাধা-মাধবকে প্রণাম করে বিদায় নিত। গৌরদাস মন্দিরে উঠে এসে রাধা-মাধবকে প্রণাম করত। তারপর মন্দির-দ্বার বন্ধ করে বাড়ি ফিরত। সে তার আগেই রাধা-মাধবকে প্রণাম করে, বাড়ি এসে গৌরদাসের জন্যে খাবার সাজিয়ে রাখত।

এমনই ভাবে বছর কয়েক কাটল। সংসারে প্রাচুর্য ছিল না—অভাবও ছিল না। দু বেলা দু মুঠো ভাত, বছরে চারখানা শাড়ি, গৌরদাসের সামান্য আয়েও জুটে যেত। এর বেশী আর কিছু প্রয়োজন ছিল না তার। বাবার কাছে যখন থাকত তখনও তো এর বেশী কোন দিন জোটে নি। পল্লীগ্রামের শান্ত-স্নিগ্ধ সরল জীবনের মধ্যে তার মন তৃপ্তি পেয়েছিল। হয়তো কোন কোন দিন হাতে যখন কাজ থাকত না, গৌরদাস পাঠশালায় থাকত, সে একা বসে থাকত, তখন অতীত জীবনের রঙিন স্বপ্ন-মাখানো ছবি রামধনুর মত বর্ণ-সম্ভার বিস্তার করে মনের আকাশে ভেসে উঠত। মন মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। কিন্তু তা যে ছায়া মাত্র, কায়া ধরে তা কখনও যে ধরা দেবে না—মন এতদিনে বুঝতে পেরেছিল। তাই না-পাওয়ার বেদনা আর অনুভব করত না।

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ বাধল। সংসারের সব জিনিস দুর্মূল্য হয়ে উঠল। অতি কষ্টে সংসার চলতে লাগল। কিন্তু গৌরদাসের স্নেহ ও ভালবাসায় কোন কষ্টই মনে দাগ বসাতে পারত না। দিনের পর দিন শুধু নুন-ভাত খেয়ে, ছেঁড়া কাপড়ে কোনমতে গা ঢেকে, গৌরদাস হাসি মুখে দিন কাটিয়ে দিত। সেই হাসির আলো তারও মুখ থেকে অসন্তোষ ও অতৃপ্তির আঁধার দূর করে দিত।

দাদু—প্রেমদাস বাবাজীর অসুখ হয়েছে, বাঁচবার আশা নেই, তাদের দুজনকে দেখতে চেয়েছেন—খবর নিয়ে লোক এল। রাধা-

মাধবের পুজোর ব্যবস্থা করে, একজন বৈষ্ণবের উপর ভার দিয়ে, গৌরদাস তাকে নিয়ে কাঁচামাটি গেল।

যুদ্ধ বাধবার কিছু পরেই রতন চালের আড়তে কাজ ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। সেখানেই সে থাকত এখন। তাদের গ্রামের কাছে একটা সৈন্যদের ছাউনি ও একটা এরোড্রাম তৈরি হচ্ছিল ; সেখানে সে একজন বাঙালী কণ্ট্রাক্টারের অধীনে সরকারের চাকরি করত। চন্দ্রাকেও নিয়ে গিয়েছিল। প্রেমদাসের অসুখের খবর পেয়ে তারাও দেখতে এসেছিল। অনেক দিন পরে দেখা হল ওদের সঙ্গে। চন্দ্রা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, কত দিন দেখি নি তোকে! কেমন আছিস ? সে শুধু একটু হেসে বলল, দেখতেই তো পাচ্ছিস।

চন্দ্রা আগের চেয়ে মোটাসোটা হয়েছিল। পরনে দামী মিহি শাড়ি, গায়ে গয়না। রতনের পোশাক-পরিচ্ছদ বেশ দামী। চাকরিতে নাকি রতনের খুব রোজগার হচ্ছিল। ওর মনিবের আয় নাকি মাসে দশ হাজার টাকা। মনিবের যদি মাসে দশ হাজার হয়, চাকরের কোন্ না ছ শো টাকা হবে! বলে পরম আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল রতন। গম্ভীর হয়ে উঠে ভারিক্কী সুরে বলল, তা গৌরদার চলছে কেমন ? ওর জমি-জমা যা আছে—তাতে আজকালকার দিনে চলা তো উচিত নয়।

সে বলল, পাঠশালা থেকে কিছু আয় হয়।

মাথা দুলিয়ে রতন বলল, পাঠশালা খুলেছে বুঝি! তা ভাল।

সে বলল, সহজে কি খুলেছে ? অনেক বলে-কয়ে খোলাতে হয়েছে।

রতন বলল, ওই তো গৌরদার দোষ, নতুন কিছুই করতে চায় না। বাপ-পিতামহ যে পথ ধরিয়ে দিয়ে গেছেন—সে পথ থেকে এক ইঞ্চি নড়বে না। তাতে কি দিন চলবে আজকাল। না হলে কাজের অভাব কি! আনাচে-কানাচে কাজ হাতছানি দিয়ে ডাকছে—গিয়ে নিলেই হল।

সে বলল, একটা জুটিয়ে দাও না।

রতন চোখ নাচিয়ে বলল, ওই তো হাতের কাছেই কাজ রয়েছে

একটা। যে কাজটা আমি করতাম, সেইটার জন্যেই লোক চাইছিল আড়তদার। একটি বিশ্বাসী লোক চাইছিল আড়তদার। আমি একবার বলে দিলেই গৌরদাকে কাজটা দেবে নিশ্চয়।

রতন তার সামনে গৌরদাসের কাছে কথাটা পাড়ল। গৌরদাস মৃদু হেসে বলল, তা কী করে হবে? রাধা-মাধবের সেবা—

সে বলেছিল, পাড়ার কোন লোককে দিয়ে ব্যবস্থা করলেই হবে।

গৌরদাস বলল, দু-একদিন চলে। কিন্তু বেশি দিনের জন্যে সম্ভব নয়।

গৌরদাস দু দিন থেকে চলে গেল। সে থেকে গেল। গৌরদাস যতক্ষণ ছিল, চন্দ্রা ওর পাশ থেকে নড়ে নি। ওকে একান্তে নিয়ে গিয়ে কীর্তন গাওয়াল, নিজেও গাইল তার সঙ্গে। গৌরদাস ও চন্দ্রা দাদুকে কীর্তন শোনাল এক দিন। দাদু আশীর্বাদ করলেন ওদের। চন্দ্রা এক দিন নিজের হাতে রেঁধে খাওয়াল গৌরদাসকে। সব খরচ দিল রতন। গৌরদাস চন্দ্রার রান্নার খুব প্রশংসা করল। চরিতার্থতার আনন্দে চন্দ্রার মুখ-চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল।

রতন গেল দিন কয়েক পরে। যাবার আগের দিন রতন এক কাণ্ড করল। একজোড়া দামী শাড়ি বাজার থেকে কিনে আনল। সন্ধ্যে-বেলায় দাদুর ঘরে মামীমা, মাসীমা আর সে বসেছিল। এমন সময়ে চন্দ্রা শাড়ি-জোড়াটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। মামীমা জিজ্ঞেস করলেন, ওই শাড়ি রতন তোর জন্যে কিনে আনল বুঝি? চন্দ্রা বলল, আমার জন্যে নয়, দিদির জন্যে।

সে আপত্তি জানিয়ে বলল, আমার তো শাড়ি রয়েছে, আর আমার দরকার হবে না।

মাসীমা বললেন, ছোট ভগ্নীপতি মান্যি করে দিচ্ছে, নিবি না কেন?

মামীমা বললেন, যা পরছিস ওই তো, না, আর কিছু আছে! ওই যদি হয় তো ও বেশি দিন নয়। নিয়ে নে যা পাচ্ছিস। আজকাল সাধারণ একখানা শাড়ির যা দাম হয়েছে, তাই লোকে কিনতে পারছে

না। ও-রকম শাড়ি কেনা যার-তার সাধ্য নয়। রতনের অঢেল পয়সা, তাই চন্দ্রাকে ও-রকম শাড়ি ছাড়া কিছু পরায় না।

রতন পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ তুলতেই চোখোচোখি হল। রতন বলল, ছোট ভাইয়ের কাছে নিতে দোষ কি দিদি! রতনের চোখ থেকে মিনতি যেন গড়িয়ে পড়ছিল।

বাধ্য হয়ে নিতে হল তাকে। তবু দয়ার দান ভেবে মন সারাক্ষণ খুঁত খুঁত করতে লাগল।

চন্দ্রা কিন্তু সত্যিই খুশি হয়েছিল। যে কদিন তারা একসঙ্গে ছিল, তার মধ্যে সে সত্যিই ভালবেসে ফেলেছিল তাকে। গৌরদাস যা বলেছিল তা খুবই সত্যি। চন্দ্রার স্বভাবই ছিল মিষ্টি। সকলের সঙ্গেই সে ভাল ব্যবহার করত। মন যতই বিরূপ হোক, কারও প্রতি রূঢ় ব্যবহার করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

দাত্ব—প্রেমদাস বাবাজী সপ্তাহ তুই পরে দেহরক্ষা করলেন। রতনকে খবর পাঠান হয়েছিল। সে যথাসময়ে এসে পড়ল। দাত্বর শেষ-কাজ যথাযোগ্য সমারোহের সঙ্গে করল। এ তল্লাটের সমস্ত বৈষ্ণবদের নিমন্ত্রণ করা হল। তাঁরা দলে দলে এসে হাজির হলেন। ত্রুটিহীন সেবায় পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁরা বিদায় নিলেন। তুটি নাম-করা কীর্তনের দল এসেছিল। তুদিন ঘরে দিবারাত্র নাম-সঙ্কীর্তন হল। রতনের বিস্তর খরচ হল দাত্বর কাজে। সকলে ধন্য ধন্য করতে লাগল। মানুষের মত মানুষ! গৌরদাসও এসেছিল। এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল শুনল। তাকে কেউ পাত্তা দিল না।

সব কাজ শেষ হবার পর তারা বিদায় নিল। মাসীমা কাঁদতে লাগলেন। বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, কবে আসবি আবার? গৌরদাসকে বার বার বলতে লাগলেন, বাবা, মাঝে মাঝে এক-একবার দেখা দিয়ে যেয়ো। আর কদিন বাঁচব!

একবার ইচ্ছে হল মাসীমাকে বলতে—মাসীমা তুমিই এস না আমাদের কাছে তু-চার দিনের জন্য, কিন্তু স্বামীর সাংসারিক অবস্থার কথা ভেবে নিরস্ত হল।

ফিরে এসেই আবার দৈনন্দিন জীবনের জোয়াল কাঁধে চড়ালো। ভগ্নচক্র জীর্ণ রথটিকে অমসৃণ পথে টানতে টানতে কাঁচামাটির স্মৃতি ধীরে ধীরে অন্তরের সদর মহল থেকে সরে গিয়ে কখন অন্দর মহলে আত্মগোপন করল।

কয়েক মাস কাটল। মাসীমার অসুখের খবর পেয়ে আবার কাঁচামাটি যেতে হল। মাসীমা মারা গেলেন। শেষ কাজের সব খরচ তাদের দিতে হল। গৌরদাসের হাতে টাকা ছিল না। তার এক-এক হাতে এক গাছা করে দু গাছা সোনার চুড়ি ছিল। বাবা গড়িয়ে দিয়েছিলেন আঁট হয়ে বসেছিল। একটু বড় করে, নূতন করে গড়িয়ে নেবার মত সামর্থ্য ছিল না গৌরদাসের। পরতে কষ্ট হত। তবু বাবার স্মৃতিচিহ্ন বলে হাত থেকে খুলে ফেলতে মন রাজী হয় নি। মাসীমার কাজে সেই দু গাছা চুড়ি হাত থেকে খুলে দিল। তারই টাকায় মাসীমার শেষ কাজ করা হল। আড়ম্বর হল না .বটে কিন্তু নিখুঁতভাবে কাজটা হল।

একটা দিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে আজ।

পাড়ার মেয়েরা বাগানের পুকুরে স্নান করত। সকলেই তাকে স্নেহ করত, সম্মান করত। সে যে এক সময়ে শহরে থাকত, লেখাপড়া শিখেছিল, ভাগ্যদোষে এই অজ-পাড়াগাঁয়ে এসে পড়ে আছে, তারা শুনেছিল, বিশ্বাসও করেছিল। গৌরদাসের পাড়াতেই মামারবাড়ি ছিল। যদিও মামারবাড়ির কেউ বেঁচে ছিল না। ভিটে পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সম্পর্কে পাড়ার প্রৌঢ়া গিন্নীরা তাকে নাতবউ বলে ডাকতেন। হাসি-ঠাট্টাও করতেন—বিশেষ করে পাড়ার মোড়ল অদ্বৈতদাস বাবাজীর স্ত্রী রাঙাদিদিমা। তাঁর গায়ের রঙ খুব ফরসা ছিল বলেই তাঁর নামের আগে ওই বিশেষণটা তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা বসিয়ে দিয়েছিল। রাঙাদিদিমা তাদের দুজনকে স্নেহ করতেন। প্রায়ই খবরাখবর নিতেন। বাড়িতে কোন ভাল খাবার জিনিস জুটলে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁদেরও অবস্থা ভাল ছিল না।

অদ্বৈতদাস কীর্তন গাইতেন ভাল। পাড়ার কয়েকজন লোককে নিয়ে একটি কীর্তনের দল ছিল তাঁর। মাঝে মাঝে ডাক আসত ভক্ত গৃহস্থদের বাড়ি থেকে। তাতে কিছু আয় হত। কিছু জমিজমাও ছিল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই মন ছিল উঁচু। রাঙাদিদিমার কাছাকাছি পাড়ার সব বাড়িতে যাওয়া-আসা ছিল। তাঁরই চেষ্টাতে পাঠশালার ছাত্র কিছু বেড়েছিল। আয়ও কিছু বেড়েছিল।

একদিন বিকেলে পুকুরে গা ধুতে গিয়ে রাঙাদিদিমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ঘাটে আর কেউ ছিল না। রাঙাদিদিমা তাকে লক্ষ্য করছিলেন, সে বুঝতে পারে নি। রাঙাদিদিমা ঘাট থেকে উঠে আসবার মুখে বললেন, হ্যাঁ নাতবউ, তোর কি সন্তান-সন্ততি কিছু—

কয়েকদিন ধরে তারও মনে ওই সন্দেহ জেগেছিল। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে নি। লজ্জায় মুখ লাল করে জবাব দিল, কী করে জানব বলুন।

পরদিন সকালে নদী থেকে স্নান করে ফেরবার সময়ে দিদিমা খবরটা গৌরদাসকে দিয়েছিলেন।

শোবার ঘরের বারান্দায় বসে সে পূজোর আয়োজন করছিল। গৌরদাস এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। প্রথমে সে কারণটা বুঝতে পারে নি। মুখ তুলে বিস্ময়ের স্বরে বলল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? কাপড় ছাড়বে না?

গৌরদাস গম্ভীর মুখে বলল, ভাল করে দেখছি তোমাকে।

কৃত্রিম কোপের সঙ্গে সে বলল, কখনও দেখ নি নাকি?

গৌরদাস জবাব দিল, রাস্তায় রাঙাদিদির সঙ্গে দেখা হল—

লজ্জায় তার মাথাটা নেমে আসতে চাইছিল। কণ্ঠস্বরে কাঁপন লাগবার উপক্রম। তবু অবুঝের ভান করে বলল, বেশ তো, কী হয়েছে তাতে?

গৌরদাস হেসে বলল, তুমি নাকি মা হবে?

রাধা জবাব দেয় নি। একবার মুখ তুলে স্বামীর চোখে চোখ মিলিয়ে মুখ নামিয়ে নিল।

সেইদিন থেকে তাদের জীবনের রূপ বদলে গেল। একসঙ্গে এতদিন পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে থেকেও তাদের ওতপ্রোতভাবে মিলন ঘটে নি। অতি সূক্ষ্ম অপরিবাহী অভ্র-পাতের মত তার কৈশোর জীবন তাদের তুটি সত্তাকে বিযুক্ত করে রেখেছিল। সন্তান-সম্ভাবনা তাদের একান্তভাবে মিলিয়ে দিল।

সংসারে তার মূল্য বেড়ে গেল। গৌরদাসের সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি। কাজ-কর্মে চলা-ফেরায় হাজার রকমের বিধি-নিষেধের বেড়া উঠল তার চারপাশে। পাড়ার প্রবীণা মেয়েরা বিশেষ করে রাঙাদিদিমা, সকাল-সন্ধ্যায় এসে কত রকমের উপদেশ দিতে লাগলেন।

চন্দ্রা ও রতন খবর পেয়ে দেখতে এল একদিন। চন্দ্রা তখন কাঁচামাটিতে মামীমার কাছে ছিল। রতনের মনিবের কাজ চলছিল কাঁচামাটি থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে। ওখানে বনের ধারে একটা এরোড্রাম, আর সৈন্যদের ছাউনি তৈরি হচ্ছিল। রতন সেখানেই থাকত। মাঝে মাঝে এসে খবর নিয়ে যেত।

সেই কয়েকটা মাস যে কত আনন্দে কেটেছিল, স্পষ্ট মনে পড়ে রাধার। স্বামী-স্ত্রীতে কত তর্ক! স্বামী বলত, খোকা তোমার মত দেখতে হবে! অমনই ফরসা রঙ, অমনই চমৎকার মুখ, কোঁকড়া চুল। সে মুখ চোখ ঘুরিয়ে বলত, তুমি জ্যোতিষী কিনা! গুণে দেখেছ! আমি বলছি, তোমার মত দেখতে হবে। তুজনে প্রত্যেকদিন কত রাত পর্যন্ত কত আলোচনা ভবিষ্যতের কত স্বপ্ন দেখা! খোকা বৈষ্ণব-বাড়ির ছেলেদের মত মানুষ হবে না। স্কুলে লেখাপড়া শিখবে, খুব বড়লোক হবে, তার মা-বাবাকে কত ভালবাসবে, ভক্তি করবে। লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে তার দিকে।

অবশেষে তাদের স্বপ্ন সত্যিই সফল হল। খোকা এল কোলে। ননীর মত কোমল, টগর ফুলের মত গায়ের রঙ। যেমন সুন্দর মুখ, তেমন সুন্দর চোখ, তেমনই সুন্দর দেহের গঠন। তাকালে চোখ ফেরানো যেত না এমন। গৌরদাসের আর আনন্দের সীমা রইল না।

রতন ও চন্দ্রা খবর পেয়ে খোকাকে দেখতে এল। তুজনে তুটি

টাকা হাতে দিয়ে খোকার মুখ দেখল। রতন গৌরদাসকে ডেকে ঠাট্টা করে বলল, রাধা-মাধবের ভাবী সেবাইত এসে হাজির হয়েছে! চন্দ্রা খোকাকে বুকে চেপে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে দিল। আড়ালে খোকার হাতে একটি গিনি দিয়ে বলল, কাউকে বলিস নি দিদি। এই কমাসে কিছু কিছু করে টাকা জমিয়েছিলাম। পাড়ার একজনকে বাজারের মল্লিকদের দোকানে পাঠিয়ে একটি গিনি কিনে আনিয়েছিলাম। খোকার জন্যে দুটি দুধ-বালা গড়িয়ে দিবি। যাবার আগে খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে বলল, খোকাকে নিয়ে চললাম দিদি। তারপর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, খোকাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না দিদি। চোখ দুটি তার ছলছল করে উঠল।

খোকার অন্নপ্রাশনের সময় এসে গেল। হাতে টাকা নেই। গৌরদাস ভেবে অস্থির। সে বলল, থাকগে বাপু, কাজ নেই কিছু করে। রাধা-মাধবের পূজো করিয়ে শ্রীচরণের ফুল মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ো। একটু পায়স-ভোগ দিয়ে তাই একটু মুখে দিয়ো। ওতেই হবে। গৌরদাস হাঁ বা না, কিছুই বলল না। দিন কয়েক পর তেলিদের একজনকে ডেকে এনে বলল, মঙ্গলীকে কিনতে চায় লোকটি। মঙ্গলী তো দুধ-টুধ কিচ্ছু দেয় না এখন। ওকে বিক্রি করে দিই। কি বল? সে প্রবল আপত্তি জানাল, না-না তা হবে না, পেটে বাচ্চা রয়েছে ওর, দুদিন পরে প্রসব করবে, খোকন আমার দুধ খাবে। গৌরদাস বলল, পঞ্চাশ টাকা দাম দিতে চাইছে। বিক্রি করে কাজটা চালাই এখন। পরে আবার একটা গাই কিনলেই হবে। খোকার অন্নপ্রাশনে দু পাঁচজন লোক খাবে না, দু পাঁচজন লোক আশীর্বাদ করে যাবে না, সেটা কি ভাল হবে? সে আর আপত্তি করল না।

পঞ্চাশ টাকা নগদ হাতে তুলে দিয়ে লোকটি মঙ্গলীকে নিয়ে চলে গেল। যাবার সময়ে মঙ্গলীর কী করুণ ডাক! বার বার থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল। লোকটা ওর গলার দড়ি ধরে ওকে টেনে নিয়ে চলে গেল। গৌরদাসের মত তারও চোখ থেকে

জল গড়িয়ে পড়ল।

অন্নপ্রাশনের ছুদিন আগেই রতন ও চন্দ্রা এসে পড়ল। মঙ্গলীকে বিক্রি করা হয়েছে শুনে চন্দ্রা বলল, ছিঃ ছিঃ, দিদি! বাড়িতে কচি ছেলে। গাই আবার বিক্রি করে! আমাকে একটিবার যদি জানাতিস। গৌরদাসকে ধমকাতে লাগল, গৌরদা, কবে তোমার বুদ্ধি হবে! গাইটা বিক্রি করবার আগে একবার আমাদের বললে না?

রতন বলল, যা হবার হয়েছে, কাজটা ভাল করে করবার ব্যবস্থা করতে হবে, বুঝলে গৌরদা।

গৌরদাস মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, হবে তো বলছ, কিন্তু—

কথা শেষ করতে না দিয়ে রতন বলল, টাকা? তার জন্যে চিন্তা নেই, টাকা আমার সঙ্গেই আছে।

রতন সব ব্যবস্থা করল। পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকে নিমন্ত্রণ করা হল। রাঙাদিদিমা ও অন্যান্য প্রবীণারা একদিন আগে থেকে এসে নানা কাজে সাহায্য করলেন। অদ্বৈতদাস বাবাজী সেদিন রাধা-মাধবের পূজা করলেন, ভোগ দিলেন। তাঁর দল নিয়ে কীর্তন করলেন। খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন খুব ভাল ভাবেই হল। সকলের খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হয়ে গেল।

সকলে খোকাকে দেখল। আশীর্বাদ করল। সকলেই পঞ্চমুখে প্রশংসা করল তাদের খোকার: চমৎকার ছেলে হয়েছে! অদ্বৈতদাস বাবাজী বললেন, একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন! শ্রীজ্ঞানদাস ঠাকুরের বংশে জন্ম তোমার ভাই! অনেক বৈষ্ণব-চূড়ামণি জন্মেছিলেন তোমাদের বংশে। জগতকে পাপ-তাপে তাপিত দেখে করুণা-পরবশ হয়ে তাঁদেরই কেউ আবার ফিরে এসেছেন। খোকাকে কোলে নিয়ে নত মুখে বসেছিল সে। মনে মনে বলল, কেউ তোমরা চিনতে পার নি। স্বয়ং নাড়ু-গোপাল এসেছেন আমার কোলে—যাঁকে আমি মন-প্রাণ দিয়ে চেয়েছিলাম।

সেদিন চন্দ্রা তাকে নড়তে দেয় নি। বলল, খোকনকে নিয়ে বসে থাক। আমি সব দেখছি। সারাদিন নিজে সব কাজ করল চন্দ্রা।

রতনও খুব খাটল। পরের দিন ওদের যেতে দেওয়া হল না। যে কদিন চন্দ্রা ছিল এক শয্যায় রাত কাটিয়েছিল তারা। সারারাত্রি চন্দ্রা খোকাকে বুকে জড়িয়ে রাখত।

পরদিন রতন ও চন্দ্রা চলে গল। জীবনযাত্রা আবার অভ্যস্ত পথে চলতে লাগল। একটি কাজ শুধু কমেছিল—মঙ্গলীর সেবা। শূন্য গোয়ালটার দিকে তাকালেই বুকটা খচ করে উঠত। মঙ্গলী তখনও তাদের ভুলতে পারে নি। কোন কোন দিন সন্ধ্যার আগে এসে তাদের গোয়ালে ঢুকত। তার নূতন মালিক এসে তাকে টেনে নিয়ে যেত। গৌরদাসের পাঠশালার কাজে চাড়টা কিছু বাড়ল। নিজে হতে বাড়ে নি। খোকার জন্য খরচ বেড়েছিল, দুধ কিনতে হচ্ছিল। যুদ্ধের দরুন জিনিস-পত্রের দাম চারগুণ বেড়েছিল। অতি কষ্টে সংসার চলছিল। সে অনেকদিন ধরেই গৌরদাসকে বলছিল, জমির আয়ে চলবে না। পাঠশালাটিই ভাল করে কর। মাইনে বাড়াও। সব জিনিসের দাম এত বেড়েছে, মাইনে বাড়বে না কেন?

পাড়ার মুরুব্বীদের কাছে কথাটা পাড়ল গৌরদাস। সকলে গৌরদাসের কথার যুক্তি স্বীকার করল। মাইনে কিছুটা বাড়িয়ে দিতে রাজী হল সবাই। গৌরদাস মন দিয়ে পাঠশালার কাজ করতে লাগল।

আজকাল পাঠশালায় পড়াতে যাওয়ার সময় হত না তার। খোকাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হত সারাদিন। যখন নেহাত ছোট ছিল, তখন ঘুম পাড়িয়ে এসে নিজের কাজ করত। হঠাৎ খোকন কেঁদে উঠত। হাতের কাজ ফেলে ছুটে গিয়ে কোলে তুলে নিত। কিছুতেই কোল থেকে নামতে চাইত না খোকা। হাতের কাজ পড়ে থাকত। খোকন যখন হামাগুড়ি দিতে শিখল, সর্বদা এক চোখ তার দিকে রাখতে হত। কখন কী অনর্থ বাধিয়ে বসে এই ভয়ে। বাধিয়ে বসতও এক-একদিন। একদিন পড়ে গিয়ে হাঁটুর কাছটা ছিঁড়ে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। রক্ত দেখে খোকনের কী কান্না!

একদিন একটা লঙ্কা মুখে দিয়ে চিৎকার করে কেঁদে উঠল খোকা। মুখ-চোখ লাল টক্‌টকে হয় উঠল। অনেক কষ্টে ঘুম পাড়ালো তাকে।

গৌরদাস কাজের মধ্যেও উঠে এসে মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যেত। খোকাকে পাঠশালায় নিয়ে যেতে চাইত। সে নিষেধ করত, না বাপু, মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে, ভাল করে পড়াও। এক-একবার এসে বরং দেখে যেয়ো।

মাস কয়েক কাটল। খোকা একটু বড় হল। জুঁই ফুলের কুঁড়ির মত দুটি ছোট ছোট দাঁত বার হল। দু-একটি কথা বলতে শিখল—মা, বাবা, মাসী। কথা বুঝতেও শিখল। চাঁদিনী রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে—আয় চাঁদ আয়—বললেই খোকন তার ছোট ছোট হাত দুটি চাঁদের দিকে বাড়িয়ে আ—আ—বলে ডাকত। হাত ঘুরোলেই নাড়ু দেব—বললেই খোকন তার ডান হাতের ছোট মুঠোটি ঘোরাতে থাকত। দাঁত দেখি তোমার বললেই খোকন ছোট ছোট মুক্তোর মত সাদা দাঁত দুটি বার করে দেখাত। দেখে তার বুকে আনন্দের বান ডেকে উঠত।

খোকাকে ভাঙা-চুরো কয়েকটা আজে-বাজে জিনিস হাতের কাছে দিয়ে, উঠোনে বসিয়ে দিয়ে সে রান্না-ঘরে রান্না করত। খোকা খেলা করত। অর্থহীন কত কথা বলত খোকা। কাজ করতে করতে সে মাঝে মাঝে দেখত—কোথায় রয়েছে, কী করছে খোকা। হঠাৎ চোখোচোখি হয়ে গেলে খোকা হেসে উঠত। কখনও হয়তো সে কাজে অন্যমনস্ক হয়ে থাকত; হঠাৎ মনটা চমকে উঠত—খোকা! কোন সাড়া-শব্দ নেই! কোথায় গেল খোকা! ধড়মড় করে উঠে বাইরে গিয়ে দেখত খোকা মাটির উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমন্ত খোকাকে দেখলেই বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠত তার। দেখে মনে হত—যেন সে এ জগতের নয়। এত সুন্দর! এত সুকুমার! এত মায়াবী! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মন-প্রাণ ভরে ওঠে। দেখে সাধ মেটে না, বুকে চেপে ধরে রেখেও হারাবার ভয়

যায় না। হয়তো কোন দেবশিশু পথ ভুলে এসেছে, আবার ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে।

তাড়াতাড়ি খোকাকে বুকে তুলে নিত, আঁচল দিয়ে গায়ের ধুলো মুছে দিয়ে বুকে চেপে ধরত। বুকের ভিতর নির্ভয়তা জাগত। মাকে ছেড়ে খোকা কি কখনও ফিরে যেতে পারে? স্বর্গে কি এমন মা আছে যার বুকের রক্ত অমৃত হয়ে উঠে খোকার ক্ষুধা মেটাবে?

সংসারে অভাবের কাঁটা দিন দিন তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠতে লাগল। সব জিনিসই দুর্মূল্য। চিন্তায় রাত্রে তাদের ঘুম হত না। সারারাত ছটফট করত। ভাবত, যদি ভাল ধান হয় তবেই রক্ষা। না হলে কী করে যে কী হবে—ভেবে থই পেত না তারা।

তবে চন্দ্রা মাঝে মাঝে সাহায্য করত। খোকার খরচ প্রায় তার টাকাতেই চলত।

গৌরদাসের উপর চন্দ্রার দুর্বলতা প্রায় স্পষ্ট ধরা পড়ত তার চোখে। গৌরদাসকে দেখলেই তার মুখখানি প্রভাতে উদয়াকাশের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠত। গৌরদাসকে সেবা করলে কৃতার্থ হয়ে যেত। আগে তার রাগ হত। আজকাল মায়া হত বরং। ভাবত —এতেই যদি শান্তি পায় তো পাক। কী ক্ষতি হবে তার! তা ছাড়া খোকাকে যে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তার জন্য ক্ষতি হলেও সে সব ক্ষতি হাসিমুখে সহ্য করবে।

সে বৎসরের মত বর্ষা রাধা জীবনে দেখে নি। সারা শ্রাবণ ও ভাদ্র অজস্র বর্ষণ হল। পুকুর-ডোবা জলে থই থই করতে লাগল। তাদের খিড়কির দরজা পর্যন্ত জল ঠেলে এল। নারকেল গাছের গোড়াগুলো জলে ডুবে গেল। তাদের বাড়ির সামনের মাঠটা জলে ডুবে গেল—সারা মাঠটা একটা বিস্তৃত বিলের মত দেখাতে লাগল। নদীতে একটানা বান চলতে লাগল। মাঝে মাঝে দু পাশের বাঁধ ভেঙে জমি ভাসিয়ে দিতে লাগল। আশ্বিন মাস পর্যন্ত আকাশে মেঘের আসর ভাঙতে চাইল না। একবার নীল আকাশ দেখা যেতে না যেতেই মেঘের মসীলেপন শুরু হয়ে যেত। শরতের যে প্রখর রৌদ্র শস্যচারাদের

সতেজ ও সবুজ করে তোলে, তার অভাবে চারাগুলিকে ধানের পোকায় আক্রমণ করল। কচি কচি সবুজ পাতাগুলো হলদে হয়ে উঠল। আউশ ধানের কচি শীষগুলি ক্ষীণ বিবর্ণ হয়ে উঠল। তারা যে কৈশোর অতিক্রম করে তারুণ্যে উত্তীর্ণ হয়ে শস্যকণার গর্ভধারিণী হবে--তার সম্ভাবনা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে উঠতে লাগল। চাষীদের মধ্যে হাহাকার পড়ে গেল। গৌরদাসের মুখে চিন্তার মেঘ ঘনিয়ে উঠল—এক কণাও ধান তার ঘরে বোধ হয় এবার ঢুকবে না। তার সমস্ত জমি, দেবোত্তর এক এক চকে পনেরো বিঘা জমি, সব নদীর ধারে। কতকগুলো জমিতে নদীর বান এসে বালির পুরু স্তর ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। সেখানকার ধানের চারা সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। বাকী জমিগুলিতে মড়ক লেগেছিল। প্রতিকার প্রার্থনা করে রাধা-মাধবের কাছে ভোগ দিল গৌরদাস।

সারা তল্লাটে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হল। সাংঘাতিক ম্যালেরিয়া। এক নাগাড়ে তিন-চারদিন প্রবল জ্বর। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারী চিকিৎসা হল তো রোগী বাঁচল, না হল মৃত্যু। গ্রামে ডাক্তার ছিল না। পাঁচ-ছ মাইল দূরে একজন ডাক্তার ছিলেন—রঘুনাথ ডাক্তার। খুব নাম ডাক, কিন্তু মোটা ফী। তাঁকে ডাকবার মত সঙ্গতি খুব কম লোকেরই ছিল। অনেকে বিনা চিকিৎসায় মরতে লাগল। গৌরদাস প্রতিষেধক হিসাবে সকলের জন্য স্নান-জলের ব্যবস্থা করল।

কিন্তু ম্যালেরিয়ার আক্রমণ রোধ করা গেল না কিছুতেই। খোকার উপরেই প্রথম আক্রমণ হল। একটা থালা ও একটা গেলাস বিক্রি করে ডাক্তার ডাকা হল। খোকা সপ্তাহখানেক ভুগে সেরে উঠল। কিন্তু ভারী দুর্বল হয়ে গেল। মুখখানি সরু ও লম্বাটে হয়ে উঠল; ডাগর-ডাগর চোখ দুটি আরও ডাগর দেখাতে লাগল; মুখের হাসিটি মিলিয়ে গেল; মনের আনন্দ থিতিয়ে এল। যেখানে বসিয়ে রাখত, সেখানেই বসে থাকত, অথবা ঘুমিয়ে পড়ত। তার অফুরন্ত কথা ও হাসির উৎস ক্ষীণ হয়ে উঠল। তার সারা অঙ্গ হলদে হয়ে উঠল; গৌরদাসকে সে বলল, কি হবে গো!

গৌরদাস বলল, রাধা-মাধব যা করবেন, তাই হবে—তাঁকে ডাক। তারা নিজেরাও একে একে পড়ল। গ্রামের এক কবিরাজের কাছ থেকে ওষুধ এনে খেতে লাগল। জ্বর একবার ছাড়ল কিন্তু কিছুদিন পরে আবার ধরল। শেষে একসঙ্গে দুইজনেই পড়ে গেল। মুখে জল দেবার লোক রইল না। বাঙাদিদিমা খবর পেয়ে এসে সংসারের ভার নিলেন, রাধা-মাধবের সেবার ব্যবস্থা করলেন। আর কবিরাজকে ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন।

চন্দ্রাকে খবর দেওয়া হল না। তারা নিজেরাও ভুগছিল। চন্দ্রা হয়তো নিজে আসতে না পারলেও কোন লোকের ব্যবস্থা করত। কিন্তু একজন লোক এনে খাওয়াতে তাদের ইচ্ছা ছিল না। ঘরে দু'জন লোকের মাত্র মাস তিন-চার চলবার মত খাবার ছিল।

দুর্গাপূজা এসে পড়ল। আকাশ নির্মেঘ নীল হয়ে উঠল। সূর্যের আলোয় কাঁচা সোনার রঙ লাগল। বর্ষা-ধৌত পরিচ্ছন্ন প্রকৃতি সেই আলোতে ঝলমল করতে লাগল। পুকুরের উপরটা অজস্র শালুক ও পদ্মফুলে সাদা হয়ে উঠল। ঘাসে-ঢাকা পথ-ঘাট সাদা ও বেগুনে ফুলে ভরে উঠল। সামনের সারা মাঠটায় বক ও মৎস্য-ভুক পাখির দল মৎস্য শিকার করে বেড়াতে লাগল। নদীতীরে কাশের বন ফুলে সাদা হয়ে উঠল। দুপুরে গো-চারণের মাঠে গাছের ছায়ায় রাখাল-বালকদের খেলা জমে উঠল। ঘরে ঘরে ভিক্ষুকেরা একতারা বাজিয়ে আগমনীর গান গেয়ে বেড়াতে লাগল।

দক্ষিণে সারা মাঠে পোকা লাগলেও উত্তর-মাঠের আমন ধানের গাছগুলোর বেশী ক্ষতি হয় নি। কাজেই ষোল আনা না এলেও অন্ততঃ আট আনা ফসল ঘরে আসবে—এই ভেবে চাষীদের মনে কতকটা সান্ত্বনা এসেছিল। তারা ধান-চাল বিক্রি করে পূজোর আয়োজন করতে লাগল।

কিন্তু গৌরদাসের মুখের আঁধার কাটল না। তারও। যন্ত্রের মত সে নিজের কাজ করত। রান্না করত, ঘরদোর পরিষ্কার করত, খোকার আদর-যত্ন করত। খোকা আজকাল বড় কাঁদুনে হয়েছিল।

সারাদিন কোলে থাকতে চাইত। কোল থেকে নামিয়ে দিলেই কাঁদত। খোকাকে কোলে করেই কাজ সারতে হত তাকে। গৌরদাসও নিজের কাজ যথানিয়মে ও যথাসময়ে করে যেত। কিন্তু যে আলোতে সারা গাঁয়ের মানুষের মন ঝলমল করে উঠেছিল, তার একটি ক্ষীণ রশ্মিও তাদের মনে পড়ল না। এক কণা ধানও তাদের ঘরে উঠবে না, এ তারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিল। কী করে যে তাদের সারা বছর চলবে, এই চিন্তার গাঢ় মেঘ তাদের মনের আকাশে দিবারাত্র কালো হয়ে জমেছিল। তার উপর আসন্ন পূজোর খরচ। তাদের নিজেদের কিছু হোক না হোক খোকার পোশাক না কিনে তো উপায় ছিল না। কত সাধের খোকা— ভিখারীর ছেলের মত খালি গায়ে পূজো দেখবে, ভাবলেই সারা মন ব্যথাতুর হয়ে উঠত। গৌরদাসকে জিজ্ঞাসা করল একদিন, খোকার পোশাকের কী হল? গৌরদাস জবাব দিল না। ম্লান চিন্তিত মুখে বসে রইল। গৌরদাস যখন কোন ব্যবস্থাই করতে পারল না, সে কানের ফুল দুটি খুলে গৌরদাসের হাতে দিয়ে বলল, খোকার একটা পোশাক, তোমার ধুতি, আমার শাড়ি—যা যা দরকার কিনে নিয়ে এস। গৌরদাস নিতে রাজী হয় নি প্রথমে। বলেছিল, এ ছাড়া তো আর এক দানাও সোনা নেই তোমার গায়ে। তাও আমি দিই নি। তোমার বাবার দেওয়া। এ আমি নিতে পারব না। তার চেয়ে দু-চার-খানা বাসন থাকে তো দাও, তাই দিয়ে যা হয় কিনে নিয়ে আসি। সে বলেছিল, স্বামী-পুত্রের অসময়ে কাজে লাগবে, সেই জন্যেই তো মেয়ে মানুষের গয়না পরা। যদি কোনদিন সুদিন আসে আবার গড়িয়ে দেবে। হেসে বলল, আর খোকা যদি আমার মানুষের মত মানুষ হয় তো কথাই নেই। বলে খোকাকে বুকে জড়িয়ে ধরে, মনের নিঃশেষ-প্রায় দ্বিধাটুকু সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে ফেলেছিল। তার মনে হল, সামান্য গয়না কেন, যদি খোকার জন্য, স্বামীর জন্য হৃদয়ের রক্ত দিতে হয়, বুকের হাড়গুলো একটি একটি করে খুলে দিতে হয়, তাও সে কোনদিন পিছপা হবে না।

কাঁচামাটি গাঁয়ের কাছে, বলরামপুরের বাজারে মল্লিকদের গয়নার দোকান, কাপড়ের দোকান—দুই-ই এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় দোকান। বিয়ের সময়, পূজোর সময়, চার পাশের গাঁয়ের লোক গয়না কাপড় কিনতে ওখানেই যেত। গৌরদাসও ফুল দুটি নিয়ে ওখানেই গেল। গয়নার দোকানে সে দুটি বিক্রি করে খোকার পোশাক শাড়ি-ধুতি কিনে নিয়ে এল।

যুদ্ধের বাজারে সব জিনিসের দাম তিন-চার গুণ বেড়ে গিয়েছিল। খোকার পোশাকটির দাম বেশ লেগেছিল, কিন্তু দেখে তার পছন্দ হল না। রাগ হল গৌরদাসের ওপর: ভাল মানুষ! ভাল মানুষী করলে এ সংসারে চলে! রতন হলে হয়তো এই দামে এর চেয়ে অনেক ভাল জিনিস আনত।

সপ্তমীর দিন থেকে আকাশ মেঘে ছেয়ে ফেলল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। বিকেলের দিকে আকাশ আরও কালো হয়ে উঠে চারিদিক অন্ধকার হয়ে উঠল। বাতাসের বেগ বাড়ল এবং সন্ধ্যার পর থেকে প্রবল ঝড় ও প্রবল বর্ষণ শুরু হল। সারা আকাশ আলকাতরার মত কালো হয়ে উঠল, অন্ধকারে দু হাত দূরের জিনিস দেখা দায় হয়ে উঠল, বৃষ্টির ছাট তীরের মত গায়ে লাগতে লাগল, ঝড়ের ঝাপটায় গাছপালাগুলো মাটিতে নুয়ে পড়তে লাগল, ঘরের দেওয়ালগুলো যেন দুলে দুলে উঠছে মনে হতে লাগল। এমন ঝড় সে জীবনে দেখে নি। যত রাত বাড়তে লাগল, ঝড়বৃষ্টির প্রাবল্যও তত বাড়তে লাগল। বাগানের কয়েকটা গাছ মড়মড় করে ভেঙে পড়ল। পাড়ার আরও অনেক গাছ ভেঙে পড়তে লাগল। তাদের রান্নাঘরের চালাটা উড়ে গেল, শেষে একটা দেওয়াল ভীষণ শব্দে ভেঙে পড়ল। পাড়ায় কার ঘর ভেঙে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল। নদীর একটানা গর্জন, পাখিদের আর্ত কলরব, ঝড়ের উন্মত্ত হুঙ্কার, বৃষ্টির একটানা ঝমঝম শব্দ—সব মিলে মনে হতে লাগল, তাণ্ডব নৃত্যোন্মত্ত মহাকালের চরণের আঘাতে সারা সৃষ্টি ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

শোয়ার ঘরের এক কোণে গৌরদাস ও সে জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল। তার কোলে খোকা ঘুমাচ্ছিল। ঘরের কতকটা চাল থেকে খড় উড়ে গিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছিল। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, ঘরের চালটা উড়ে যাবে, দেওয়াল চাপা পড়ে তাদের সবারই জীবন্ত সমাধি ঘটবে। তারা রাধা-মাধবকে ডাকতে লাগল।

অষ্টমীর দিন সকালে আকাশ পরিষ্কার হয়ে এল। ঝড় ও বৃষ্টি দুই কমে এল। সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিবেশীদের খবর নিতে লাগল। বড় বড় গাছ অনেক ভূমিসাৎ হয়েছিল। তাদের বাড়ির সামনে প্রাচীন বকুল গাছটা পড়ে গিয়েছিল। গ্রামের অনেক ঘর পড়ে গিয়েছিল। তেলীদের একজন বুড়ী দেওয়াল চাপা পড়ে মরেছিল। নদীর বান প্রবল হয়ে উঠে দুকূল ছাপিয়ে দিয়ে সারা দক্ষিণ মাঠ ব্যেপে প্রবল বেগে বইতে লাগল। তেলীদের চণ্ডীমণ্ডপের টিনের চালাটা উড়ে গিয়ে কতকটা দূরে একটা পুকুরে পড়েছিল। সারা গ্রামে হাহাকার পড়ে গেল। বুড়োবুড়ীরা বলাবলি করতে লাগল, মায়ের পূজোয় এমন বিপর্যয় জীবনে দেখি নি।

তাদের রান্নাঘরের চালা উড়ে গিয়েছিল। একদিকের সমস্ত দেওয়াল পড়ে গিয়েছিল। বাকী দেওয়ালগুলো গলে গলে রান্নাঘরের সারা মেঝে কাদায় ভরে উঠেছিল। হাড়ি-কুড়ি মেঝেতে গড়াচ্ছিল, চাল-ডাল, মসলার হাঁড়িগুলোও গড়িয়ে সব একাকার হয়ে গিয়েছিল। উঠোনে জল জমে কাঠগুলো সব ভিজে গিয়েছিল। কী করে যে রান্না হবে ভেবে সে দিশেহারা হয়ে গেল। খোকা সকালে ঘুমোচ্ছিল। তাকে বেশ করে ঢাকাঢুকি দিয়ে, কোমর বেঁধে ঘর-দোর পরিষ্কার করতে লেগে গেল। গৌরদাস রুটিন মাফিক সকালে উঠল, বাগানের পুকুরে স্নান সেরে এসে রাধা-মাধবের পূজোর ব্যবস্থা করতে লাগল।

দুপুরের দিকে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়ে সূর্য ঝলমল করে দেখা দিল। পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘগুলো পালিশ করা রূপোর পাতের মত ঝকঝক করতে লাগল। করাল প্রলয়ঙ্করী রূপ

বর্জন করে প্রকৃতি আবার শান্ত রূপ ধারণ করল। সারা পৃথিবী শুভ্র আচ্ছাদনে সর্বাঙ্গ ঢেকে গভীর ক্লান্তিতে নিদ্রামগ্না হয়ে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। চারিদিকের সর্বনাশের হাহাকারের মধ্যেও মানুষের মনে ক্ষীণ আনন্দের সুর বাজতে লাগল। সন্ধ্যার পর যখন আকাশের চাঁদ উঠল, চাঁদের আলোয় আকাশ ও পৃথিবী উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চিক্কণ তরু-পল্লব চিকমিক করতে লাগল, তখন মনে হল, যে কল্যাণময়ী মা মানুষের ঘরে এসেছেন, তাঁরই প্রসন্ন হাসিতে সারা বিশ্ব-প্রকৃতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তাঁরই স্পর্শ পড়ল মানুষের মনে। তারা নিজেদের দুঃখ-দৈন্য ভুলে গেল।

বিজয়ার পরদিন এল চন্দ্রা ও রতন। খোকার জন্য বেশ ভাল পোশাক এনেছিল, তাছাড়া নানারকম খেলনা। তার জন্য শাড়ি, গৌরদাসের জন্য ধুতি। চন্দ্রা এসেই খোকাকে কোলে তুলে নিল, তাকে নিজের হাতে পোশাক পরিয়ে দিল। খোকার মুখে হাসি দেখা গেল। গৌরদাস ও রতন কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিল। গৌরদাস বলল, আমারও অমন মাসী থাকলে, আমাকে অমন পোশাক পরিয়ে দিলে, আদর করলে, ঠিক অমনই হাসতাম।

চন্দ্রা মুখ-চোখ ঘুরিয়ে আবদার-ভরা কণ্ঠে বলল, অমন পোশাক এনে দিলে পরতে তুমি? চোখোচোখি চেয়ে রইল দুজনে। রতনের সঙ্গে তারও চোখোচোখি হল। রতনও যে বোঝে সব—বুঝতে দেরি হল না তার।

বিকেলে সে ও চন্দ্রা বসেছিল শোবার ঘরে বারান্দায়। উঠোনে একটা দড়ির খাটিয়ায় রতন বসে চা খাচ্ছিল। বড় বড় লোকের কাছে কাজ করে চা খাওয়ার অভ্যাস হয়েছিল রতনের। সঙ্গে করে চা-চিনি নিয়ে এসেছিল চন্দ্রা। এসেই বার করে দিয়েছিল। সে কিছুই বলে নি। চন্দ্রা তাদের অবস্থা বুঝেই কাজ করেছিল, তাতে বলবার কিছুই ছিল না। চা চন্দ্রাই তৈরি করে দিল। গৌরদাস বাড়িতে ছিল না। রাত্রে ওদের দুজনের জন্য খাওয়ার একটু বিশেষ ব্যবস্থা করবার ইচ্ছে হয়েছিল তার। জিনিস-পত্র

আনতে সে-ই তাকে গ্রামে পাঠিয়েছিল।

রতন বলল, রান্নাঘরটা তো গেছেই। শোবার ঘরের চালের অবস্থাও সঙ্গীন। ওটার অন্তত কিছু ব্যবস্থা করা দরকার।

তার বলতে ইচ্ছে হল, দরকার যে তা আমাদের জানা আছে। কিন্তু ব্যবস্থাটা হবে কী করে? কিন্তু চুপ করে রইল। চন্দ্রা বলল, দিদি বলছে, ছোট ভাই থাকতে দাদার কী ভাবনা? সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল সে,—চন্দ্রার মিথ্যে কথা, আমি কিছুই বলি নি।

রতন বলল, আমি সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি। এ এমন একটা কিছু খরচের ব্যাপার নয়। কিন্তু গৌরদা রাজী হবে কী? ও তো এক উদ্ভট মানুষ! নিজের ভাঙা-ফুটো যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট। কেউ ভাল করে দিতে চাইলেও শুনবে না।

চন্দ্রা ভ্রূ কুঁচকে প্রতিবাদ করল, ছোট ভাইয়ের প্রণামী দেওয়ার মত যদি দাও তো নেবে না কেন? দান করার মত দিলে নেবে না। কারও কাছে কিছু চাইবে না কখনও—ওই ওর চিরদিনের স্বভাব!

গৌরদাসের নিন্দা সহ্য হত না চন্দ্রার। সত্যিই ভালবাসত ওকে।

পরদিনই ওরা চলে গেল।

গৌরদাসের বাবা ও ঠাকুরদার আমলে প্রতিবৎসর রাসপূর্ণিমায় সারাদিনব্যাপী উৎসব হত। এ তল্লাটের বৈষ্ণবেরা নিমন্ত্রিত হতেন। ষোড়শোপচারে রাধা-মাধবের ভোগ, কীর্তন ও বৈষ্ণব-ভোজন হত। পাড়ার সকলে নিমন্ত্রিত হত। গৌরদাসের আমলে তা সম্ভব হয় নি, সঙ্গতিতে কুলোয় নি। কাঁচামাটিতেও প্রেমদাস বাবাজীর আমলে রাসপূর্ণিমায় সমারোহে উৎসব হত। তাঁর মৃত্যুর পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে বৎসর মামীমা ঝোঁক ধরলেন মেয়ে জামাইয়ের কাছে, আমার শরীরের যা অবস্থা, এ বৎসর কাটবে না বোধ হয়। রাসপূর্ণিমায় ঠাকুরের আমলে যেমন উৎসব হত তেমনই কর। যাবার আগে দেখে যেতে চাই। রতন তাই ধূমধাম করে উৎসবের আয়োজন করল।

রতন আগেই তাদের নিমন্ত্রণ করেছিল। গৌরদাসের যাওয়া হল না। উৎসবের দিন তাদের নিয়ে যাবার জন্য রতন গরুর গাড়ি পাঠিয়ে দিল। গৌরদাস যেতে পারবে না জানাল। বলল, রাধা-মাধবের কাজ ফেলে যাই কী করে?

সে বলল, ভোগ সেরে তো যেতে পার। আগে তো তাই যেতে—

গৌরদাস জবাব দিল না। সে খোকাকে নিয়ে চলে গেল।

তিন দিন ধরে মহা সমারোহে উৎসব হল। নাম-করা কীর্তনীয়াদের কীর্তন হল। বৈষ্ণব-ভোজন হল। গৌরদাস একটি দিনও এসে দেখে গেল না। তিনদিন ধরে চন্দ্রা কত ছটফট করল। তার এক-চোখ এক কান গৌরদাসের আসার প্রতীক্ষায় পেতে রাখল। কতবার কত লোকের গলা শুনে চমকে উঠল চন্দ্রা, গৌরদা এল বোধ হয়, না দিদি! আসে নি শুনে মুখখানি শুকিয়ে গেল তার। কতবার বলল, গৌরদা না এলে উৎসব মানায় না, ভালও লাগে না। কীর্তন শুনতে শুনতে বলল, যত বড় কীর্তনীয়া হোক, গৌরদার মত গলা কারও নেই। এ সব দেখে শুনে রাগ হচ্ছিল তার। মনে মনে বলছিল এত ছটফটানি কেন রে বাপু! তোর বর তো নয়। মুখে ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, কোণ-পেঁচা মানুষ! এত লোকের সঙ্গ ভাল লাগবে কেন তার? সেই ভাঙা ঘরটিতে একা একা থাকতেই ভালবাসে—

রতন খুঁতখুঁত করল বারকয়েক: এ তল্লাটের কেউ আসতে বাকী রইল না। গৌরদা শুধু এল না। খোকাকে দুজনেই খুব আদর করল। চন্দ্রার অত মন খারাপ, তবু খোকার আদর-যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি করল না।

রতন বারকয়েকই শোনাল, প্রায় হাজার টাকা খরচ হল। তবু মায়ের সাধ মেটাতে পারলাম—এতেই আমার এত খরচ সার্থক মনে হচ্ছে।

একবার তাকে একান্তে পেয়ে বলল, যাদের ভালবাসি তাদের

জন্যে প্রাণটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে আমার কুণ্ঠা নেই, জান দিদি! সে বলেছিল, মানুষের মত মানুষরা তো তাই করে ভাই!

দু সপ্তাহ পরে ফিরল তারা! চন্দ্রা আসবার সময়ে কুড়িটা টাকা হাতে দিয়ে বলল, খোকার দুধের জন্যে আর ঘরের চালাটা সারিয়ে নিবি। পরে আরও পঠিয়ে দেব। রতন বলল, গৌরদাকে বলবে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি ও না আসাতে। ঘরটা মেরামতের ব্যবস্থা যত শীঘ্র পারি করছি—

বাড়িতে ফিরে গৌরদাসকে দেখে সে চমকে উঠল। এই কদিনে আধখানা হয়ে গিছল। কণ্ঠার হার বার করা, মুখ চোখ ফ্যাকাশে। সে উদ্বেগের সঙ্গে বলল, জ্বর হয়েছিল বুঝি?

খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে গৌরদাস বলল, হ্যাঁ, প্রতিপদের দিন থেকেই—

প্রশ্ন করল, খবর দাও নি কেন?

গৌরদাস বলল, সেখানে এত উৎসব! খবর দিয়ে ব্যস্ত করি নি তাই—

সে ধারাল কণ্ঠে বলল, যদি বাড়াবাড়ি হত, তা হলেও খবর দিতে না?

গৌরদাস জবাব না দিয়ে খোকাকে আদর করতে লাগল। চন্দ্রার কথা মনে হল—সে নিজ থেকে কিছু চাইবে না। সত্যি তাই! উদ্ভট মানুষ! ক্ষীণ হাসি তার ঠোঁটে ফুটেই মিলিয়ে গেল।

কার্তিকের শেষের দিকে মামীমা অসুখে পড়লেন। চন্দ্রা খবর দিতেই সে খোকাকে নিয়ে চলে গেল। অগ্রহায়ণের প্রথমেই মামীমা মারা গেলেন। রতন মামীমার শেষ কাজ যতদূর সম্ভব ভাল ভাবেই করল। গৌরদাসও গিয়ে হাজির হয়েছিল। সব কাজ চুকে যাবার পর, তাদের ফেরবার কথা হতেই চন্দ্রা কাঁদতে লাগল। বলল, মা চলে গেল। আমি একা থাকতে পারব না এখানে। আমাকে নিয়ে চল তোরা—

রতনকে বলতেই বলল, একা থাকতে হবে কেন? আমার পিসতুতো বোন আর ভাগনে ওর কাছে এসে থাকবে। তা ছাড়া আমাদের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাকে দিনরাত আর ওখানে থাকতে হবে না। বাড়ি থেকেই এর পর সাইকেলে যাওয়া আসা করব।

সে বলল, তবু মনটা এখন খারাপ, চলুক আমাদের সঙ্গে। একটু সামলে ফিরে আসবে।

চন্দ্রা তাদের সঙ্গে এল। খোকার সম্পূর্ণ ভার নিজের হাতে তুলে নিল! খোকাকে বুকে করে ও মাতৃশোক ভোলবার চেষ্টা করতে লাগল।

আসবার দু দিন পরেই ও একদিন খোকাকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে বলল, হ্যাঁ দিদি, রোজ এতটুকু করে দুধ খেয়ে খোকার কি পেট ভরে?

সে বলল, ওইটুকুই তো খায় বরাবর, তা ছাড়া ভাত মুড়ি খাওয়াই একটু করে।

চন্দ্রা বলল, ওখানে তো এক সের করে রোজ দুধ খাচ্ছিল। হজমও করছিল। সে বলল, ওখানে জুটছিল, তাই খাচ্ছিল। একটু চুপ করে থেকে বলল, পাড়ায় কারও বাড়িতে এমন দুধ হয় না যে বিক্রি করতে পারে। গাঁয়ের এক গয়লা ওই জোলো দুধটুকু দিয়ে যায়, তাও টাকায় মাত্র দু সের—

চন্দ্রা বলল, বেশ তো ওই দুধই বেশী করে নেও খোকার জন্যে। একটু চুপ করে বলল, গৌরদার যা শরীরের অবস্থা ওরও একটু করে দুধ খাওয়া উচিত।

সে বলল, সবই তো বুঝি চন্দ্রা! কিন্তু হাতে পয়সা কই? এ বছর একটি কণা ধানও আসবে না ঘরে। সব ধান নষ্ট হয়ে গেছে। দুদিন পরে রোজ এক মুঠো করে ভাত জুটবে না আমাদের; রাধা-মাধবের ভোগ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।

চন্দ্রা বলল, আমাদের একটা গরুর বাছুর হয়েছে। সেটাকে

পাঠাতে বলে দিলে হয় না?

সে বলল, ছি, তা কি হয়! অনুনয়ের স্বরে বলল, ও নিয়ে কিছু বলাবলি করিস নে চন্দ্রা। এখনই হয়তো রতন পাঠিয়ে বসবে। সে ভারী লজ্জার কথা হবে।

একদিন বিকেল থেকে খোকা খুঁতখুঁত করতে লাগল। কিছুতেই তার কোল ছাড়তে চাইল না। মুখ থমথম করতে লাগল। খোকার বুকে গাল রেখে তার মনে হল, গাটা একটু গরম। আবার জ্বর হল নাকি! বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠল তার। চন্দ্রাকে বলল, আবার জ্বর হবে বোধ হয়। চন্দ্রা খোকার গায়ে হাত দিয়ে বলল, গাটা একটু ট্যাকট্যাক করছে। তাতে ভয় কী? তুই খোকাকে নিয়ে শুয়ে থাক, আমি কাজ সারছি। খোকাকে চাপাচুপি দিয়ে শুইয়ে সে তার পাশে শুয়ে রইল।

রাত্রে জ্বর বাড়ল। সকালে খোকা জ্বরে অঘোর। গৌর রাধা-মাধবের পূজা সেরে এসে স্নান-জল খোকার মাথায় ছড়াল। সে বলল, আমার ভাল মনে হচ্ছে না। ডাক্তার ডাকতে হবে। গৌর মুখ চুন করে বলল, আজকের দিনটা দেখি।

পরদিন কবরেজকে ডেকে নিয়ে এল গৌরদাস। কবিরাজকে ফী দিতে হত না। ওষুধের দামও লাগত না। গৌরদাসের বাবার সঙ্গে হৃদ্যতা ছিল তাঁর। কবরেজ মশায় ভাল করে দেখে বললেন, খারাপ জ্বর। সময় নেবে। ওষুধ দিলেন। দিন কয়েক ওষুধ খাওয়া হল। জ্বর ছাড়ল না। খোকা দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল।

খোকা সেরে উঠবে না! ভাবতেই বুকের ভিতরটা হিম হয়ে যেত। সারা চৈতন্য যেন অসাড় হয়ে আসত। একদিন কাঁদতে কাঁদতে গৌরদাসকে বলল, খোকাকে কি মেরে ফেলবে? যেমন করে হোক ভাল চিকিচ্ছে করাও।

গৌরদাস চুপ করে রইল। চন্দ্রা বলল, আমার কাছে কিছু টাকা আছে। ভাল ডাক্তারকে ডাক।

ডাক্তার এলেন। দেখলেন খোকাকে। বললেন খারাপ ম্যালেরিয়া।

ছুঁচ ফুটিয়ে দেহে ওষুধ ঢোকাতে হবে। সে তো ভয়ে অস্থির। চন্দ্রা সাহস দিল : কিসের ভয়। তাদের গাঁয়ে কত ছেলেকে ছুঁচ ফুটিয়ে ওষুধ দিয়েছে। ওষুধ দেওয়ার সময় চন্দ্রা খোকাকে কোলে নিয়ে রইল। সে ও দৃশ্য চোখে দেখতে পারল না।

জ্বর কমল না। খবর পেয়ে রতন এল। অনেক টাকা খরচ করে জেলা-শহর থেকে বড় ডাক্তার আনল। ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করবার জন্য ভাগনেকে এনে রাখল। রোজ নিজে এসে খবর নিয়ে যেতে লাগল।

সারা দিনরাত সে খোকার মাথার কাছটিতে বসে, খোকার মুখের দিকে তার সমস্ত দৃষ্টিশক্তি, তার সমস্ত চেতনা, একাগ্র করে, তাকিয়ে থাকত। স্বামী ও সংসারের কথা, তাদের প্রতি তার কর্তব্য, কিছুই মনে রইল না। জগতের পরিসীমাকে সঙ্কীর্ণ করে শুধু খোকাকে ও নিজেকে ঘিরে রাখল, আর তার বাইরে যারা রইল তাদের সঙ্গে যোগসূত্র সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে নিল। সংসারের সব ভার তুলে নিল চন্দ্রা। রান্নাবান্না, পূজোর আয়োজন, গৌরদাসকে দেখা-শুনা, খোকার পথ্যের ব্যবস্থা আর সংসারের যাবতীয় কর্তব্য সব। কাজের ফাঁকে ফাঁকে খোকার কাছে এসে খবর নিয়ে যেত, পথ্য নিয়ে এসে খোকাকে খাওয়াত, জোর করে তাকে খেতে পাঠিয়ে দিয়ে খোকার কাছে বসত, রাত্রে জোর করে তাকে শুইয়ে নিজে সারারাত খোকার পাশে বসে থাকত।

খোকার জীবনদীপ দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। হাসত না, কাঁদত না, কোন কিছুর জন্যই ঝোঁক করত না। শুধু নির্জীবের মত চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকত, ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়ত। যেন নিঃশ্বাসের সঞ্চয় নিঃশেষ-প্রায় হয়ে আসছিল। যেন এই জীবন থেকে সে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিল। কিন্তু যতই সে দূরে সরে যেতে লাগল, তার মাতৃহৃদয় সহস্র বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে লাগল। তার খোকা, যাকে সে একদিন কল্পনায় গড়েছে, দেহে ধারণ করেছে, অপরিসীম যন্ত্রণার মধ্যে পৃথিবীতে এনেছে,

হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ দিয়ে পালন করেছে, সহস্র তন্তু দিয়ে যাকে নিজের সত্তার সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে, সে-ই একান্তভাবে তার খোকা, তাকে ছেড়ে চলে যাবে, তার মন তা বিশ্বাস করতে চাইত না।

সে রাত্রির স্মৃতি তার মনের গায়ে গভীর ভাবে আঁকা আছে। সেদিন সকাল থেকেই খোকার অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছিল। সে কিছুই বুঝতে পারে নি। কিন্তু অন্য সকলে বুঝতে পেরেছিল। রতন সকালে এসেছিল। এসেই শহর থেকে ডাক্তার আনবার জন্য গিয়েছিল। ডাক্তার নিয়ে এল সন্ধ্যের কিছু আগে। তিনি খোকাকে দেখলেন, ইনজেকশন দিলেন। তারপর চলে গেলেন। যাবার আগে ওদের নাকি বলে গিয়েছিলেন, কোন আশা নেই। রাত্রি কাটবে না। তাকে এ কথা কেউ জানায় নি। ডাক্তার যাবার পর ওরা কেউ খোকার কাছে এল না। অনেকক্ষণ পরে চন্দ্রা একবার এল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করল, ডাক্তারবাবু কী বললেন? খোকা আমার ভাল হবে তো? চন্দ্রা ঘাড় নেড়ে জানাল, ভাল হবে। চন্দ্রার ফোলা ফোলা চোখ দেখে সে বলে উঠল, তুই কাঁদছিস কেন? চন্দ্রা বলল, না, কাঁদি নি তো! সে বলল, কাঁদিস নে। খোকা আমার নিশ্চয় ভাল হবে। রাত্রি বাড়তে লাগল। বাইরে বাকী সকলে যখন চরম বিদায় মুহূর্তের জন্য প্রতীক্ষা করছিল, সে নিঃশঙ্কচিত্তে নিশ্চিত বিশ্বাসে খোকার পাশে বসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে খোকার কপালের, দেহের ঘাম মুছিয়ে দিতে লাগল। গালের উপর গাল রেখে দেহের উত্তাপ পরীক্ষা করতে লাগল। খোকা যেদিন সুস্থ হয়ে উঠে আবার মা বলে ডাকবে, ভাত খাব মা বলে ঝোঁক ধরবে, হেসে দুটি ছোট ছোট হাতে তালি দেবে, ছোট ছোট দাঁত কটি বার করে হাসবে, নানা বায়না নিয়ে নানা দুষ্টামি করে তাকে ব্যতিব্যস্ত করে দেবে, সেই আনন্দময় দিনগুলির স্বপ্ন দেখতে লাগল। চন্দ্রা যে বাইরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে কাঁদছিল, লক্ষ্যও করল না।

গৌরদাস এল একবার। বলল, রাধা-মাধবের চরণামৃত খাইয়ে দিই একটু। সে বলল, না থাক ঘুমোচ্ছে খোকা। কত ঘাম হচ্ছে দেখছ? আজ বোধ হয় জ্বরটা ছেড়ে যাবে। আবার আঁচল দিয়ে খোকার সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিল।

গৌরদাস কিছুই বলল না। চলে গেল বাইরে।

মধ্যরাত্রে সব শেষ হয়ে গেল। যে ক্ষীণ নিঃশ্বাস প্রবাহের সূত্রটুকু জীবনের সঙ্গে খোকাকে বেঁধে রেখেছিল সহসা তীব্র আক্ষেপে তা ছিঁড়ে গিয়ে মৃত্যুর অতল অন্ধকারে খোকার শিশু-আত্মা কোথায় তলিয়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল, খোকা, খোকা! কী হল গো! চন্দ্রাও চিৎকার করে কেঁদে উঠল, খোকা চলে গেল, দিদি!

খোকার শীর্ণ দেহ সবলে বুকে চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠল সে, খোকা, খোকনধন! ফিরে আয়, বাবা! রাধা-মাধবের মন্দিরে গৌরদাস পড়েছিল। ধূলি-ধূসর দেহে টলতে টলতে এসে মাটিতে বসে পড়ে দু হাতে মাথা গুঁজে প্রাণপণ শক্তিতে কান্না চাপতে লাগল।

পাড়ার সকলে এসে হাজির হল একে একে। রতনই সব ব্যবস্থা করল।

সে খোকাকে কোলে নিয়ে প্রস্তর-মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল। দু চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াচ্ছিল, কিন্তু কণ্ঠে তার ভাষা ছিল না। পুত্র-শোকের উত্তুঙ্গ বিপুলতার সামনে ভাষা মূক হয়ে গিয়েছিল; আঘাতের প্রচণ্ডতা অনুভূতির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

চন্দ্রা এসে ধীরে ধীরে ডাকল, দিদি, দিদি! মুখের দিকে তাকাতেই বলল, খোকাকে যে রওনা হতে হবে। বলেই কান্না চাপবার জন্যে আঁচল দিয়ে মুখ চাপল। সে ধীরে ধীরে খোকাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, ওকে পোশাকটা পরিয়ে দে। চন্দ্রা রতনের দেওয়া পোশাকটি এনে খোকাকে ধীরে ধীরে

পরাল। সে বসে বসে দেখছিল। বলল, কত শান্ত হয়ে গেছে দেখেছিস ? আগে কিছুতে পরতে চাইত না। হাত পা ছুঁড়ে নাস্তানাবুদ করত, এখন একেবারে চুপচাপ নিরীহ ঠাণ্ডা ছেলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাকে ভাল লাগে না, তাই চলে গেল। এবার ভাল মা পাবে, বড়লোক বাবা পাবে, কত আদর-যত্ন, গয়না-গাঁটি ভাল ভাল পোশাক পাবে। আমরা তো কিছুই দিতে পারি নি। ভাল করে দুধই খাওয়াতে পারি নি, এক ফোঁটা জোলো দুধই খাইয়ে রেখেছিলাম।

চন্দ্রা কাঁদতে কাঁদতে খোকাকে জামা পরিয়ে দিল, মুখ মুছিয়ে দিল, চোখে কাজল দিয়ে, কপালে টিপ এঁকে দিল। সে বসে বসে দেখছিল। বলল, আমার কোলে দে। কোলে দিতেই ওকে বুকে তুলে ধরে বলল, চল্ যাই। চন্দ্রা বলল, তোকে যেতে হবে না, আমার কোলে দে।

সে বলল, পাগল! আমি যাব বৈকি! ভাল করে বিছানা পেতে শুইয়ে দেব, যেন কোন কষ্ট না হয়। তারপর কাছটিতে বসে থাকব, সারাদিন সারারাত। খোকা যদি আবার জেগে উঠে আমাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদে। চল যাই। বলে উঠে দাঁড়াল। রতন এসে বলল, কেন এমন করছ দিদি, তুমি বুদ্ধিমতী, সবই বোঝ—

সে বিহ্বল-চক্ষে তার দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। কথা বোধগম্য হচ্ছিল না তার। তার খোকার সঙ্গে সে যাবে, এতে চন্দ্রা বা রতনের আপত্তি কিসের ? আর আপত্তি থাকলেই বা সে শুনবে কেন ?

রতন বলল, খোকা তোমার রাধা-মাধবের কাছে চলে গেছে। মন্দিরেই তাকে পাবে। ওই দেহটার উপরে আর মায়া রেখে লাভ নেই দিদি! ওটা দাও আমাকে। বলে এগিয়ে এসে খোকাকে বুক থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। রাগে তার সর্বদেহ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তার বুক থেকে তার খোকাকে ছিনিয়ে নেবে!

গৌরদাস এল একবার। বলল, রাধা-মাধবের চরণামৃত খাইয়ে দিই একটু। সে বলল, না থাক ঘুমোচ্ছে খোকা। কত ঘাম হচ্ছে দেখছ? আজ বোধ হয় জ্বরটা ছেড়ে যাবে। আবার আঁচল দিয়ে খোকার সর্বাঙ্গ মুছিয়ে দিল।

গৌরদাস কিছুই বলল না। চলে গেল বাইরে।

মধ্যরাত্রে সব শেষ হয়ে গেল। যে ক্ষীণ নিঃশ্বাস প্রবাহের সূত্রটুকু জীবনের সঙ্গে খোকাকে বেঁধে রেখেছিল সহসা তীব্র আক্ষেপে তা ছিঁড়ে গিয়ে মৃত্যুর অতল অন্ধকারে খোকার শিশু-আত্মা কোথায় তলিয়ে গেল। সে চিৎকার করে উঠল, খোকা, খোকা! কী হল গো! চন্দ্রাও চিৎকার করে কেঁদে উঠল, খোকা চলে গেল, দিদি!

খোকার শীর্ণ দেহ সবলে বুকে চেপে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করে উঠল সে, খোকা, খোকনধন! ফিরে আয়, বাবা! রাধা-মাধবের মন্দিরে গৌরদাস পড়েছিল। ধূলি-ধূসর দেহে টলতে টলতে এসে মাটিতে বসে পড়ে দু হাতে মাথা গুঁজে প্রাণপণ শক্তিতে কান্না চাপতে লাগল।

পাড়ার সকলে এসে হাজির হল একে একে। রতনই সব ব্যবস্থা করল।

সে খোকাকে কোলে নিয়ে প্রস্তর-মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল। দু চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়াচ্ছিল, কিন্তু কণ্ঠে তার ভাষা ছিল না। পুত্র-শোকের উত্তুঙ্গ বিপুলতার সামনে ভাষা মূক হয়ে গিয়েছিল; আঘাতের প্রচণ্ডতা অনুভূতির সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

চন্দ্রা এসে ধীরে ধীরে ডাকল, দিদি, দিদি! মুখের দিকে তাকাতেই বলল, খোকাকে যে রওনা হতে হবে। বলেই কান্না চাপবার জন্যে আঁচল দিয়ে মুখ চাপল। সে ধীরে ধীরে খোকাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বলল, ওকে পোশাকটা পরিয়ে দে। চন্দ্রা রতনের দেওয়া পোশাকটি এনে খোকাকে ধীরে ধীরে

পরাল। সে বসে বসে দেখছিল। বলল, কত শান্ত হয়ে গেছে দেখেছিস ? আগে কিছুতে পরতে চাইত না। হাত পা ছুঁড়ে নাস্তানাবুদ করত, এখন একেবারে চুপচাপ নিরীহ ঠাণ্ডা ছেলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমাকে ভাল লাগে না, তাই চলে গেল। এবার ভাল মা পাবে, বড়লোক বাবা পাবে, কত আদর-যত্ন, গয়না-গাঁটি ভাল ভাল পোশাক পাবে। আমরা তো কিছুই দিতে পারি নি। ভাল করে দুধই খাওয়াতে পারি নি, এক ফোঁটা জোলো দুধই খাইয়ে রেখেছিলাম।

চন্দ্রা কাঁদতে কাঁদতে খোকাকে জামা পরিয়ে দিল, মুখ মুছিয়ে দিল, চোখে কাজল দিয়ে, কপালে টিপ এঁকে দিল। সে বসে বসে দেখছিল। বলল, আমার কোলে দে। কোলে দিতেই ওকে বুকে তুলে ধরে বলল, চল্ যাই। চন্দ্রা বলল, তোকে যেতে হবে না, আমার কোলে দে।

সে বলল, পাগল! আমি যাব বৈকি! ভাল করে বিছানা পেতে শুইয়ে দেব, যেন কোন কষ্ট না হয়। তারপর কাছটিতে বসে থাকব, সারাদিন সারারাত। খোকা যদি আবার জেগে উঠে আমাকে দেখতে না পেয়ে কাঁদে। চল যাই। বলে উঠে দাঁড়াল। রতন এসে বলল, কেন এমন করছ দিদি, তুমি বুদ্ধিমতী, সবই বোঝ—

সে বিহ্বল-চক্ষে তার দিকে তাকিয়ে রইল কতক্ষণ। কথা বোধগম্য হচ্ছিল না তার। তার খোকার সঙ্গে সে যাবে, এতে চন্দ্রা বা রতনের আপত্তি কিসের ? আর আপত্তি থাকলেই বা সে শুনবে কেন ?

রতন বলল, খোকা তোমার রাধা-মাধবের কাছে চলে গেছে। মন্দিরেই তাকে পাবে। ওই দেহটার উপরে আর মায়া রেখে লাভ নেই দিদি! ওটা দাও আমাকে। বলে এগিয়ে এসে খোকাকে বুক থেকে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করল। রাগে তার সর্বদেহ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। তার বুক থেকে তার খোকাকে ছিনিয়ে নেবে!

চিৎকার করে বলল সে, কেড়ে নিয়ে যেতে চাও! খবরদার বলছি! চন্দ্রা তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ও কী করছিস দিদি! ছেড়ে দে খোকাকে। ও যে আর আমাদের নেই রে। রতন খোকাকে ছাড়িয়ে নিতেই সে চিৎকার করে উঠল, ওগো শুনছ, খোকাকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে! ও মা গো! বলে তীব্র ক্রন্দনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল!

সারারাত্রি তার কোন চেতনা ছিল না। পরদিন সকালে চেতনা হবামাত্র সে পাশে তাকিয়ে দেখল, খোকা নেই। বুকটা ধড়াস করে উঠল—কোথায় গেল খোকা!

ডাকল, খোকা! খোকা!

চন্দ্রা শিয়রে বসেছিল। কেঁদে উঠে বলল, খোকা যে চিরদিনের জন্যে চলে গেছে দিদি! বাস্তবের তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে বিস্মৃতির মায়াজাল এক মুহূর্তে টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে গেল। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। যে দুঃখস্রোত জমাট বেঁধে ছিল, তা গলে গলে চোখ দিয়ে ঝরতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে ক্রন্দনের বেগ একটু শান্ত হলে জিজ্ঞাসা করল, ও কোথায়!

চন্দ্রা বলল, রাধা-মাধবের মন্দিরে।

সে বলল, রাস-পূর্ণিমায় খোকাকে নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। সেই পাপে কি আমার বুকের ধনকে নিয়ে গেলেন তিনি! কিন্তু খোকা তো শুধু আমার ছিল না। খোকা তো ওরও। ওতো কোন অপরাধ করে নি! ওর এ শাস্তি হল কেন?

চন্দ্রা বলল, সেই কথাই তো রাধা-মাধবকে গৌরদা কাল থেকে জিজ্ঞাসা করছে, ওঁর সামনে পড়ে পড়ে, মাথা ঠুকে ঠুকে। খোকা যাবার সময়ে একবার উঠে এসেছিল। ওকে বলল, একবারটি আমার কোলে দাও। খোকাকে কোলে নিয়ে বলল, যাও বাবা! ভারী কষ্ট পেলে আমার কাছে। রাধা-মাধব যেন এর পর দয়া করেন। খোকাকে ফিরিয়ে দিয়ে তারপর মন্দিরে ঢুকল। আর বেরোয় নি।

শোকের তীব্রতা ক্রমে শান্ত হয়ে এল। কিন্তু তার মন সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের মধ্যে ফিরে আসতে চাইল না। চারপাশে পরম ঔদাস্যের আবরণ রচনা করে সংসার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখল। সারাদিন শোবার ঘরটিতে যেখানে খোকা শুয়ে থাকত, চুপ করে সে সেখানে বসে থাকত। সমস্ত চৈতন্যকে বর্তমান থেকে গুটিয়ে নিয়ে অতীতের মধ্যে মেলে দিয়ে পুরনো দিনগুলির স্বপ্ন দেখত। চন্দ্রা মাঝে মাঝে টেনে নিয়ে গিয়ে কথা বলে গল্প করে তাকে বর্তমানের মধ্যে নিয়ে আসবার চেষ্টা করত। কিছুক্ষণের জন্য ফিরে আসত, সাংসারিক দু-চারটে কর্তব্য কোনমতে সেরে দিয়ে আবার ধ্যানাবেশের মধ্যে অন্তর্ধান করত।

খোকার মৃত্যুর পরদিন থেকে গৌরদাস তার দৈনন্দিন জীবনে ফিরে গেল। বাইরে তার বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। তবে পূজোর সময় দীর্ঘতর হয়ে উঠল, মন্দিরে ঢুকে আর বেরোতে চাইত না। চন্দ্রা জলখাবার সাজিয়ে ঘর-বার করত। গৌরদাস পূজান্তে গদগদ কণ্ঠে প্রার্থনার পর প্রার্থনা করত। রাত্রেও ভোগারতির পর অনেক রাত্রি পর্যন্ত কীর্তন করত। সে শোবার ঘরের বারান্দায় শুয়ে থাকত। চন্দ্রা পাশে বসে থাকত। কীর্তন শেষ হবার উপক্রম হতেই চন্দ্রা খাবার সাজিয়ে গৌরদাসের জন্য অপেক্ষা করত। গৌরদাস ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করত, তোমার দিদিকে খাইয়েছ? চন্দ্রা ঘাড় নেড়ে জানাত, হ্যাঁ।

গৌরদাস বলে উঠত, ভাগ্যি তুমি ছিলে চন্দ্রা! তোমার ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না। চন্দ্রা মাথা নিচু করে বসে থাকত।

প্রায় মাসখানেক কাটল। সে ধীরে ধীরে সংসারের মধ্যে ফিরে আসতে লাগল। চন্দ্রার সঙ্গে দু-চারটে কাজ করতে লাগল, পূজোর সময়ে চন্দ্রার সঙ্গে পাশে গিয়ে বসতে লাগল, কীর্তনের সময়ও মন্দিরের রোয়াকে চন্দ্রার পাশে গিয়ে বসতে লাগল। ক্রমে একটি একটি করে চন্দ্রার কাছ থেকে সব কাজই সে নিজের হাতে তুলে নিল। চন্দ্রা কিন্তু রাধা-মাধবের ও গৌরদাসের সেবার ভারটি তাকে ছাড়ল না।

দিন কয়েক পরে রতন এসে চন্দ্রাকে নিয়ে গেল। বলল, তার পিসীমার খুব অসুখ। বাঁচবেন না বোধ হয়। এই পিসীমার কাছেই মানুষ হয়েছিল সে।

দিন চলতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। অভ্যাস মত কাজ। মনের সঙ্গে কোন যোগ ছিল না। হাত চলতে থাকত, মন থাকত পিছনে পড়ে—অতীতের হারানো দিনগুলির মধ্যে। স্বপনপুরের কথাও খুব মনে পড়ত—বাবার কথা, মাসীমার কথা, দাদার কথা, অচিন্ত্য, অপূর্ব-অনাদিদাদের কথা। বীরেনদার কথাও। ভাবত, তারা কোথায় আছে, কী করছে! সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে-বর্তে আছে, না, তার মত দুঃখের অনলে পুড়ছে? গৌরদাসের কাজ-কর্ম ছিল না। রাধা-মাধবের মন্দিরে যতক্ষণ পারত কাটাত। বাকী সময়টা রোদে রোদে মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াত। ধান-কাটা চলছিল মাঠে। দক্ষিণ মাঠে ধান কিছুই হয় নি। তাদের অর্ধেকের বেশী জমি তো বালিতে ঢাকা পড়েছিল। বাকী জমিগুলোতে ধানে পোকা লেগেছিল। ওই জমিগুলোর ফসলে দু হপ্তাও চলবার আশা ছিল না। বাড়িতে যা চাল ছিল ফুরিয়ে এল। রাধা-মাধবের পূজো বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হল। পাঠশালা বন্ধ হয়ে গেল। পাড়ার লোকেরা বলল, খাওয়া জুটছে না—লেখাপড়া! তা ছাড়া গ্রামে ছেলেমেয়েদের জন্য জমিদারবাবু একটা পাঠশালা খুলে দিয়েছিলেন। পড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছিলেন। সম্প্রতি তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা বসছিল। জমিদারবাবু নাকি পরে বাড়ি তৈরি করিয়ে দেবেন। পাড়ার দু-চারজন ছেলে, যারা পড়াটা চালাবে ঠিক করেছিল, ওখানেই পড়তে যেত। জমিদারবাবু কলকাতায় বারো মাস থাকতেন। মাস কয়েক আগে কলকাতায় জাপানী বোমা পড়েছিল। জমিদারবাবু সপরিবারে—মানে মেয়েদের ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। বড় বড় ছেলেরা অবশ্য কলকাতায় ছিল, কাজকর্ম দেখছিল।

কোন দিক থেকে আয়ের কোন উপায় ছিল না। অথচ রাধা-

মাধবের পূজো না করলে চলবে না। দু বেলা দু মুঠো না খেলেও চলবে না। পূজো বন্ধ ও অনাহারে মৃত্যু দুই-ই আসন্ন হয়ে উঠেছিল। এই অবশ্যম্ভাবী সঙ্কটের কালো মেঘ গৌরদাসের মন থেকে আনন্দের আলো নিঃশেষে মুছে দিয়েছিল। মুখে দুশ্চিন্তা ও চোখে শঙ্কা বাসা বেঁধেছিল। মাঝে মাঝে তার কাছে কাছে ঘুরত। কিছু বলবার চেষ্টা করত। কিন্তু কিছু না বলেই আবার চলে যেত।

স্বামীর সঙ্গে তার কথাবার্তা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! দূর থেকে ওর দিকে কখনও কখনও তাকিয়ে থাকত। মনে হত অচেনা লোক। খোকার মৃত্যু ভূমিকম্পের মত তাদের পায়ের তলার মাটি ধসিয়ে দিয়ে, তাদের দুজনের মধ্যে একটি গভীর সুপরিসর ফাটলের সৃষ্টি করেছিল। ফাটলের দু ধারে দুজন ছিল দাঁড়িয়ে। কাছাকাছি হবার উপায় ছিল না। স্পৃহাও ছিল না। তার মনের মধ্যে গৌরদাসের ওপরে অভিমান জমে উঠেছিল। কেন সে এই অজ পাড়াগাঁয়ে এমন ভাবে পড়ে রইল। রতনের মত কেন সে উপার্জনের পথ খুঁজল না। যে দেবতা বিপদে একবিন্দু সাহায্য করতে পারল না, তারই সেবায় কেন সে পড়ে রইল। যদি সে রতনের মত রোজগার করত, তা হলে খোকাকে হয়তো এমন করে হারাতে হত না। যে পুরুষ তার স্ত্রী-সন্তানকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখতে পারে না, সে মানুষ নয়—পশুরও অধম।

চালের হাঁড়ি খালি হয়ে এল একদিন। গৌরদাস বাড়িতে ফিরতেই সে হাঁড়িটা তার সামনে নামিয়ে দিল। খালি হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে গৌরদাসের মুখ শুকিয়ে গেল। কিছুই না বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ভাবল, কোথায় গেল? ভিক্ষে করতে নাকি? ওইটুকু করলেই তো পুরুষার্থের চরম!

কিছুক্ষণ পরে গৌরদাস ফিরে এল। একটা বস্তায় দশ-বারো সের চাল। রান্নাঘরের মেঝেতে ঢেলে দিয়ে বলল, রাঙাদিদিমার কাছে ধার নিয়ে এলাম, পরে শোধ দিয়ে দেব।

এবার তাকে বলতে হল, কী করে দেবে ?

গৌরদাস বলল, উপায় হয়ে যাবে। অদ্বৈতদাস বাবাজী একদিন জমিদারবাবুর কাছে নিয়ে যাবেন।

রতন এল একদিন। তার পিসীমা মারা গিয়েছিলেন। তাঁর শেষ-কাজ, নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইল। সে বলল, আমাকে আর কোথাও যেতে বলো না ভাই!

রতন বলল, কী করবেন? অদেষ্ট! সহ্য করে নিতেই হবে। চলুন, ঠাঁই নাড়া হলে, পাঁচজনের সঙ্গে মিশলে মনটা হয়তো একটু ভাল হবে।

গৌরদাস বাড়িতে ছিল না। রতন জিজ্ঞাসা করল, গৌরদা কোথায় বেরিয়েছে?

সে বলল, ভিক্ষেয় বোধ হয়।

রতন দু চোখ কপালে তুলে বলল, অ্যাঁ! সেকি!

সে বলল, তা ছাড়া চলবে কী করে শুনি? ঘরে একদানা চাল নেই। বাসন-কোসনও এমন কিছু বাড়তি নেই যা বিক্রি করা চলে।

রতন বলল, সত্যি ভিক্ষে করছে?

সে বলল, ভিক্ষে ছাড়া আর কী? ধার বলে নিয়ে আসছে। শোধ তো কোন দিন হবে না। একে ভিক্ষে ছাড়া কী বলে?

রতন কিছুক্ষণ ভেবে বলল, একটা কিছু দাও দেখি, ডালা কিংবা বস্তা।—বলেই রান্নাঘরের কোণ থেকে নিজেই একটা ডালা বার করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ঘণ্টাখানেক পর ফিরে এল এক ডালা চাল নিয়ে। গ্রামের দোকান থেকে কিনে নিয়ে এল। নামিয়ে দিয়ে বলল, তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও তো গৌরদার এতেই দিনকতক চলে যাবে, তারপর ব্যবস্থা করছি।

সে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যবস্থা?

রতন বলল, ওকে চাকরি করতে টেনে নিয়ে যাব।

রাধা-মাধবের সেবার কি হবে?

জমিদারবাবু গাঁয়ে এসেছেন শুনলাম। রাধা-মাধবের ভোগ চালাতে পাচ্ছে না খবর পেলেই ওর হাত থেকে ভার কেড়ে নিয়ে ব্যবস্থা করবেন।

কে খবর দেবে?

রতন মুচকি হেসে বলল, খবর দেবার লোকের অভাব হবে না।

রতন কাছে বসে নানা গল্প করতে লাগল। কত গল্প। কত নতুন নতুন জায়গায় যায়, কত রকমের লোকের সঙ্গে মেশে—তার গল্প। যার কাছে চাকরি করে তার গল্প। মস্ত ধনী! কত রকমের ব্যবসা। বাবা মস্ত উকিল ছিলেন। আগের মনিব এঁর ভাইপো। তিনি কলকাতার কাছে একটা বড় কাজ করছেন। এই নতুন মনিব এঁর উপর ভার দিয়েছেন এখানকার কাজের। এই বয়সেই খুব কাজের লোক। বয়স? কত আর হবে? ত্রিশ-বত্রিশ। চেহারা? চমৎকার! দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। শক্তিমান পুরুষ। কুস্তি করেন রোজ। এইখানেই থাকেন! হাওয়া-জাহাজের নামবার জায়গা হয়েছে। আর সৈন্যদের ছাউনি। আরও অনেক বাঙালী আছেন। ভাল ডাক্তার এসেছেন একজন সম্প্রতি। বাবুর অফিস আছে সেখানে। অনেক বাবু অফিসে কাজ করে। আরও কত লোক কাজ করছে। বাবুকে বলে গৌরদাসকেও কাজে ঢুকিয়ে দিতে পারব নিশ্চয়।

সে চুপ করে শুনছিল। রতন সম্প্রতি কলকাতা গিয়েছিল ওর মনিবের সঙ্গে। সেখানকার কত রকম গল্প করতে লাগল। শুনতে শুনতে তার মনে হল, রতন কিছু লেখাপড়া না শিখেই এত কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। আর গৌরদাস—খুব না হোক কতকটা লেখাপড়া শিখেছে, সেই কুয়োর ব্যাঙ হয়ে বসে আছে; চাষা-ভুষোদের দা'ঠাকুর হয়ে কেতাথ হয়ে গেছে।

সে একসময়ে বলল, চন্দ্রাকে সেখানে নিয়ে যাও না কেন?

রতন বলল, ও যেতে চায় না। না হলে ওখানে থাকবার বাড়ি পাওয়া যায়। অনেকে পরিবার নিয়ে থাকেও। একটু চুপ

করে থেকে বলল, পিসীমা মারা গেলেন। কাঁচামাটির ওপর টান তার আর রইল না। এখন ওর ওখানে গিয়ে থাকলেই ভাল হয়। তা কিছুতেই যাবে না—দেখবেন। আসল কথা, ভারী কুনো স্বভাবের। কারও সঙ্গে মেশামেশি করতে চায় না। তা ছাড়া যারা বরাবর পাড়াগাঁয়ে মানুষ তাদের শহরের লোকদের সঙ্গে মিশ খায় না। ক্ষোভের স্বরে বলল, ভগবান মুঠো ভর্তি করে কাউকে কিছু দেন না দিদি! খুঁত থাকেই।

বলেই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। ওর চোখের দৃষ্টিটা তার মুখের উপর এঁটে রাখল। চোখে চোখ মিলতেই চোখ নামিয়ে নিতে হল তাকে।

গৌরদাস এল অনেক বেলায়। গামছায় সের কয়েক চাল।

রতনকে দেখে ম্লান হেসে বলল, কখন এলে? পিসীমা কেমন?

রতন বলল, পিসীমার বৃন্দাবন-প্রাপ্তি হয়ে গেছে। শেষ কাজ তো আমাকেই করতে হবে। আমাকেই ছেলের মত মানুষ করেছিলেন। তা তোমরা যাচ্ছ কবে?

গৌরদাস বলল, তোমার দিদিকে নিয়ে যাও। আমার যাওয়া হবে না।

সেকি! যাবে না কেন? রতন বিস্ময়ের স্বরে বলল।

পরে বলব, চালগুলো রেখে আসি। বলে গৌরদাস চালগুলো রাখতে রান্নাঘরে ঢুকল।

রতন হাঁক দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চালগুলো জোটালে কী করে?

গৌরদাস বলল, জনকয়েক ছেলের মাইনে বাকী ছিল। তাদের কদিন ধরেই তাগিদ দিচ্ছিলাম। আজ চাল দিয়ে শোধ করল।

পরদিন রতনের সঙ্গে কাঁচামাটি চলে গেল সে। যাবার আগে গৌরদাস তার কাছে এসে দাঁড়াল। সে জিজ্ঞাসা করল, যাবে না কেন? রতন এত করছে আমাদের জন্যে—

গৌরদাস বলল, রাধা-মাধবের একটা ব্যবস্থা না করে নড়ব না কোথাও। যদি করতে পারি, একেবারে চলে যাব এখান থেকে।

সবিস্ময়ে বলে উঠল সে, তার মানে! কোথায় যাবে?

যেখানে চাকরি জুটবে। চাকরি করব স্থির করেছি রতনের মত।

সে আশ্বস্ত হয়ে বলল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক। যদি তোমার এমন সুমতি হয় তো রাধা-মাধবের কাছে হরির লুঠ দেব। তবে কোথাও যদি যাও তো একটা খবর দেবে আশা করি।

গৌরদাস বলল, তোমাদের ওখানেই তো যাব। রতনের মনিবের কাছে চাকরি করব। রতন চাকরি করে দেবে বলেছে।

পিসীমার শেষ কাজ সাধারণ ভাবেই করল রতন। গ্রামের বৈষ্ণবদের খাওয়াল। পরের দিন রতন বাবুকে নিমন্ত্রণ করল রাত্রে খাবার জন্য। হোটেল থেকে ভাল একজন রাঁধুনি নিয়ে এল। হরেকরকম খাবার জিনিস তৈরি হল। ঘরের মধ্যে পুরু কার্পেটের আসন পেতে রূপোর থালাবাটিতে খাবার সাজিয়ে দেওয়া হল। রতন তার পুরনো মনিবের বাড়ি থেকে এসব সংগ্রহ করে এনেছিল। বাবু বাড়ির ভিতরে এলেন। সে ও চন্দ্রা দূরে একপাশে দাঁড়িয়েছিল। দেখল বাবুকে। সত্যি রূপবান পুরুষ। দীর্ঘ-দোহারা গঠন। ধবধবে ফরসা রঙ। মুখের পাশটা যতটা দেখতে পেল তাতে মনে হল মুখের গঠনও সুন্দর। সর্বদেহ ঋজু করে মাথা উঁচু করে কোন দিকে না তাকিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। চাল-চলনে ভাব-ভঙ্গিতে দাম্ভিকতা ফেটে পড়ছে মনে হল।

খাওয়া-দাওয়ার পর রতন এল চন্দ্রাকে ডাকতে। বাবু তার স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে চান বলল। চন্দ্রা রাজী হল না। বলল, যার-তার সামনে বেরোতে পারব না। রতন বলল, শুনছ দিদি, কী বলছে? যার-তার! যার দয়ায় ডান হাত চলছে সে হল যে-সে! শিবতুল্য লোক। ভাইয়ের মত স্নেহ করেন। না হলে আমার মত লোকের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেন! তাকে বলল, দিদি, তুমি দয়া না করলে মান থাকে না, একজন অন্তত যাওয়া চাই। তাকে রাজী হতে হল।

রতনের পূজোয় দেওয়া শাড়িখানা পরল। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হল। তারপর রতনের সঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকল। ঘরের ভিতরে একটা চেয়ারে বসে বাবু সিগারেট খাচ্ছিলেন। ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে তাকে নমস্কার করলেন। সে তাঁর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নমস্কার করল। চওড়া কপাল; খাড়া নাক; সরু সরু ঠোঁটে সৌজন্যের হাসি; চোখে সাপের চোখের মত জ্বলজ্বলে দৃষ্টি। মন বলে উঠল, এ যে চেনা লোক! কোথায় দেখেছি ওঁকে!

বাবু বললেন, খুব খাইয়েছেন। বহু ধন্যবাদ।

কিন্তু কোন কথাই তার কানে ঢুকল না। মন তার স্মৃতি-ভাণ্ডারের অন্ধকার কোণে পূর্বেকার সঞ্চয়গুলি হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছিল তখন।

রতন বলল, আমার স্ত্রীর দিদি। এরই স্বামীর কথা বলছিলাম আপনাকে। ধান হয় নি মোটেই, বড় কষ্ট ওদের।

বাবু তখনও তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন, আপনি কখনও স্বপনপুরে ছিলেন? আমাদের মাস্টারমশায় যতীনবাবুকে—

হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে স্মৃতিভাণ্ডারের সব কিছু আলোকিত করে তুলল। চিনতে পারল বাবুকে। বীরেনদা, বীরেন বোস—জ্যাঠামশায়ের বড় ছেলে।

সে ঘাড় নেড়ে স্বীকৃতি জানাল, হ্যাঁ।

বীরেনদা বলল, তুমি কি রাধা? তুমি এত কাছে আছ, এতদিন এখানে থেকেও জানতে পারি নি। রতন তোমাদের কথা বলে। কিন্তু নাম কোনদিন বলে নি, পূর্ব-ইতিহাসও কিছু বলে নি।

রতন হাতে স্বর্গ পেল। কৃতার্থের ভঙ্গিতে একগাল হেসে বলল, আপনি একে চেনেন, সার্!

বীরেনদা বলল, চিনব না! ছেলেবেলা থেকে দেখছি। নিজের বোনের মত। যতীনবাবু তো আমাদের একটা বাড়ি ভাড়া

নিয়ে থাকতেন, আমাদের বাড়ির কাছেই ; যতীনবাবুর ছাত্র ছিলাম, রোজ ছুবেলা যেতাম ওদের বাড়ি। মাসীমা কোথায় ?

সে বলল, মারা গেছেন। এখানেই।

বীরেনদা বিস্ময়ের স্বরে বলল, এখানে ছিলেন! এখানেই মারা গেছেন! আমি তো শুনি নি!

রতন সবিনয়ে বলল, আপনি এখানে আসবার আগেই মারা গেছেন।

বীরেনদা চলে গেল। রতনকে যাবার সময় বলে গেল, গৌরদাসকে আসতে বলো। চাকরি হবে।

সেরাত্রে ঘুম হয় নি তার। মনে হচ্ছিল, অন্ধকারের মধ্যে বীরেনদার চোখ ছুটি তখনও তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে— যেন তার দৃষ্টি তার অন্তরের মধ্যে ঢুকে ছুরন্ত শিশুর মত তার সুবিন্যস্ত কামনা-বাসনাগুলিকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। সাপের চোখ যেমন পাখিকে তার কবলের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়, তেমনই সেই চোখ ছুটি তার মনকে তার দিকে টানতে লাগল। তার বিবেক ও সংস্কারের সতর্কবাণী তাকে বার বার সামলাতে লাগল। কিন্তু রাত্রি যতই গভীর হতে লাগল, নিদ্রাকুহেলীতে বহিশ্চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল, ততই বহুদিন পূর্বের সেই আলিঙ্গনের স্মৃতি তার অন্তশ্চেতনায় স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। নদীর বন্যা-বিধ্বস্ত তীরভূমি যেমন পূর্বের অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা বিস্মৃত হয়ে বন্যার ছুঃসহ সঙ্গ পুনরায় কামনা করে, তারও অন্তর তেমনই বীরেনের সঙ্গের জন্য পিপাসু হয়ে উঠল।

রতন বার বার বলতে লাগল, বাবুর সঙ্গে যে তোমার আলাপ থাকতে পারে কখনও ভাবি নি! আগে জানতে পারলে কত কাজ হত। এত বড়লোকের ছেলের সঙ্গে আলাপ! অত বড় বড় লোকের ছেলেরা তোমার বাবার ছাত্র! তিনি বেঁচে থাকলে শহরের কোন ভাল লোকের হাতে তুমি পড়তে! তা না হয়ে অজ পাড়াগাঁয়ের গৌরদাসের হাতে পড়লে!

চন্দ্রা কাছে দাঁড়িয়েছিল, ঝাঁজালো স্বরে বলল, গৌরদা খারাপ লোক কিসে? টাকা থাকলে আর শহরে থাকলেই বুঝি ভাল লোক হয়!

দিন কয়েক পরে বিকেল বেলায় রতন বাড়ি এসে বলল, দিদি, সিনেমা দেখতে যাবে?

সিনেমার নাম শুনেছিল। দেখে নি কখনও। চুপ করে রইল।

রতন বলল, দেখ নি তো? চল, দেখে আসবে। খুব আনন্দ পাবে। মনটাও ভাল হবে।

চন্দ্রা এক পাশে কী একটা কাজ করছিল। রতনের কথা শুনে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, সিনেমা কি? রতন চন্দ্রাকে বোঝাতে লাগল, পর্দার উপরে ছবি। চলা-ফেরা করে, কথা কয়। দেখেছি আমি। আমাদের শহরে আছে। বাবুর সঙ্গে কলকাতায় গিয়েও দেখেছি কতবার। তার দিকে তাকিয়ে বলল, গৌরদাসের পাল্লায় পড়ে কিছুই তো দেখলে না, অজ পাড়াগাঁয়ে পড়ে রইলে।

চন্দ্রা শ্লেষের স্বরে বলল, তোমার পাল্লায় যে পড়েছে সেই বা কোন্ শহরে পড়েছে! সেই বা কবার থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখেছে।

রতন বলল, আমাদের কালী গাইও তো কিছু দেখে নি। তা কি আমার দোষ?

চন্দ্রা ঝাঁজিয়ে উঠল: মানে! কালী গাই আর আমি এক নাকি?

রতন বলল, হুবহু এক। একই রকম চেহারা। একই রকম বুদ্ধিশুদ্ধি। তোমাকে কোথাও নিয়ে গেলে ওরই মত ভিড় দেখে লাফালাফি করবে, কিছুই শুনবে না, বুঝবেও না।

অভিমান-গাঢ় কণ্ঠে চন্দ্রা বলল, বেশ তো। দেখেশুনে মনের মত আর কাউকে আন না—আমাকে নিয়ে সংসার করবার দরকার কি?

রেগে চলে গেল চন্দ্রা।

বিকেলে গাড়ি এল তাদের নিতে। চন্দ্রা যেতে রাজী হল না। সে বলল, আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই, বুঝব না কিছুই, আমার গিয়ে কী হবে?

রাখা গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় ছিল না। বীরেনদা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল, যাবার জন্য সানুনয় অনুরোধ জানিয়ে। লিখেছিল, ছোটবোন দাদার দাবি নিশ্চয় মানবে। এই বিশ্বাসেই সে তাকে তার সঙ্গে যেতে অনুরোধ করতে সাহসী হয়েছে।

যাবার সময় গাড়ির পিছনে বসল সে ও রতন। সামনে বীরেনদা ও ড্রাইভার। বীরেনদা গাড়ি চালাতে লাগল!

শহরে পৌছুল সন্ধ্যার আগেই।

ছবিঘরের সামনে গিয়ে গাড়ি দাঁড়াল। বেশ বড় বাড়ি। সামনেটা আলোর মালায় ঝলমল করছিল। অনেক লোকের ভিড়। ড্রাইভার টিকিট করে নিয়ে এল।

প্রথম শ্রেণীতে বসেছিল তারা! অনেক লোক ছবি দেখতে এসেছিল। মেয়ে পুরুষ দুই-ই। কত রকমের চেহারা, কত রকমের পোশাক-পরিচ্ছদ। তাদের সামনেই জনকয়েক মেয়ে বসেছিল। তাদের চেহারা, তাদের রূপ, ভাবভঙ্গি, শাড়ির বাহার ও গায়ে গয়নার প্রাচুর্য দেখে মনে হল, বড়লোকের বাড়ির মেয়ে তারা। তাদের কাছে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হতে লাগল। মনে হল সে যেন এদের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছে। সত্যি, তখন অনাহারে অযত্নে তার চেহারা অত্যন্ত কুৎসিত হয়ে উঠেছিল। প্যাকাটির মত দেহ, দারিদ্র্যের আঁচে ঝলসে যাওয়া গায়ের রঙ। চুল উঠে গিয়েছিল। পোশাকও তেমনই। রতনের দেওয়া শাড়িটাই পরে গিয়েছিল। অনেক বার পরার জন্য ময়লা হয়ে গিয়েছিল। গায়ে ঘরে-কাঁচা সেমিজ; ব্লাউজের বালাই ছিল না। শীত তখনও ছিল বলে একটা পুরনো পশমী চাদর গায়ে জড়িয়েছিল। বাবা কিনে দিয়েছিলেন। রঙ চটে গিয়েছিল।

ছবি দেখবার সময়ে এ সব কথা তার মন থেকে সরে গিয়েছিল। ছবি দেখাতেই মন ডুবে গিয়েছিল তখন। চমৎকার ছবি। মনে হচ্ছিল যেন একটি সত্যিকার ঘটনা চোখের সামনে ঘটছে। যেন কতকগুলি সত্যিকার মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা মিলন-বিরহ-

মণ্ডিত জীবন তাদের চোখের সামনে অপূর্ব শোভায় ধীরে ধীরে ফুটে উঠে শুকিয়ে ঝরে গেল। ছবিটা ঠিক মনে পড়ছে না। খুব সম্ভব ভালবাসার ছবি। দুটি ছেলে-মেয়ে—ভালবাসা হল দুজনের মধ্যে—বিয়ে হল না, মেয়েটির বিয়ে হল একজন বুড়োর সঙ্গে, ছেলেটি বিয়ে করল না, মদ খেতে খেতে মারা গেল।

বীরেনদা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছিল, কেমন লাগছে?

গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি হচ্ছিল দুজনের। একবার তার হাতটা আলগা ভাবে ধরেছিল বীরেনদা। সেই স্পর্শে তার সর্বদেহে তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে গিয়েছিল।

ফেরবার সময়ে বীরেনদা পিছনে বসল—তার পাশে। রতন বসল সামনে।

বীরেনদা নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। স্বামীর কথা, তাদের সাংসারিক অবস্থার কথা। সেও নানা কথা জিজ্ঞাসা করল। বীরেনদাও সব জানাল। বাবা মারা গেছেন, মা কলকাতায় থাকেন তাঁর বাবার কাছে। শহরের বাড়ি ভাড়া দেওয়া হয়েছে। তার কাকারা নানা কাজে নানা জায়গায় আছেন। যে কাকীমা তাঁকে মানুষ করেছিলেন, কলকাতায় থাকেন। তাঁর স্বামী কলকাতায় বাড়ি করেছেন। সেই বাড়িতেই থাকেন তাঁরা। ছোট ভাই ধীরেন কলেজের অধ্যাপক। অচিন্ত্য, অপূর্ব, অনাদিদাদের কথা কিছু জানে না বলল।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। হঠাৎ ঝাঁকুনিতে ঘুমটা ভেঙে গেল। ঘুমের ঘোরে তার মাথাটা কখন বীরেনের বুকের পাশে এসে গিয়েছিল। ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসে দেখল বীরেন রতন দুজনেই ঘুমুচ্ছে।

গাড়িটা থামল কিছুক্ষণ পরে। রতনের বাড়ির সামনে। বীরেনদার ঘুম ভাঙল। বলল, এসে গেল। সে ইতিমধ্যে নামবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। গাড়ি থামতেই তাড়াতাড়ি নেমে পড়ল। রতন নামতেই গাড়ি চলে গেল।

সে রাত্রেও তার ঘুম হয় নি। বীরেনদার স্পর্শ, কথা, চাউনি তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। নিজেকে সে ধিক্কার দিতে

লাগল। ছি ছি, এ কী করছে সে! স্বামী রয়েছে তার! একমাত্র সন্তানকে সেদিন বিদায় দিয়েছে কোল থেকে! তার কি এসব সাজে! জোর করে মনকে স্বামী ও সংসারের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। রাধা-মাধবের মূর্তি মনের মধ্যে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। তবু তার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে, সেই স্মৃতি বার বার তার মন জুড়ে বসতে লাগল।

গৌরদাসের খবর আনল রতন। বলল, ভিক্ষে করছে।

সে সবিস্ময়ে বলে উঠল, জমিদারবাবু কিছু করলেন না!

বলল, জমিদারবাবুকে কী কাজে কলকাতায় যেতে হয়েছে। ফিরলে যাবে ওরা।

চন্দ্রা বলল, ছি ছি, আজ থেকে আমার মুখে ভাত রুচবে না যে! দিদি, তুই ভাত মুখে তুলতে পারবি?

সে বলল, কি করব বল্? যদি সাধ করে কেউ কষ্ট পায় তো কে কী করবে? এখানে চাকরি হয়ে যাবে, খবর পেয়েছে তো?

চন্দ্রা বলল, ঘর-সংসার ঠাকুর-দেবতা ফেলে আসবে কী করে? তোরা সাহেব-মেম হয়েছিস। সে তো হয় নি। বৈষ্ণবের বাড়িতে এ সব সাজে না।

রতন বলল, শুনছ দিদি, কথা! গৌরদার দুঃখে বুক ফেটে যাচ্ছে ওর। বেশ তো, যাও না, রসকলি কেটে, ওর সঙ্গে খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে বেড়াবে।

সাপিনীর মত ফোঁস করে উঠল চন্দ্রা: বলতে লজ্জা করে না ওসব কথা।

রতন রোজ সন্ধ্যার পর এসে খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে পঞ্চমুখে বীরেনদার নাম-কীর্তন করত। কত দয়া! গরীবদের দু হাতে দান করেন। বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে কত খাতির! ইংরেজী বলেন সাহেবদের মত! এমনই হাসি-খুশী—কিন্তু কাজের সময় কী গম্ভীর! কী কড়া মেজাজ! কথা বলতে ভয় করে।

একদিন বলল, দিল্লীর কাছাকাছি একটা বড় কাজ হবে। বাবু আমাদের কাজটার জন্য চেষ্টা করছেন। আমাকে বললেন, যদি কাজটা হয়, যাবে নাকি? বললাম, কখনও তো ওসব দেশ দেখি নি; আপনার দয়া হয় তো যাব।

সে সভয়ে বলল, এখানকার কাজ কি শেষ হয়ে গেল? সব চলে যাবে এখান থেকে?

রতন অভয় দিল: না, বড় কাজটা শেষ হবে শীগগির। ছোটখাটো কাজ চলতেই থাকবে। অফিসও থাকবে, লোকজনও থাকবে।

সে জিজ্ঞাসা করল, ওর চাকরির কি হবে?

এলেই হবে। বড়বাবুকে বাবু বলে দিয়েছেন।

চন্দ্রা সব শুনে বলল, আমরা থাকব কোথায়?

রতন বলল, তোমরা তুজনে থাকবে এখানে। গৌরদা আসছে তো শীগগির। আর সেখানে স্থায়ী কাজ যদি চলে, থাকবার জায়গা যদি পাওয়া যায়, আর ডাল-রুটি খেয়ে যদি থাকতে পার তো নিয়ে যাব তোমাকে।

সে বলল, ওকেও ওখানে নিয়ে যেয়ো। একসঙ্গে থাকা যাবে সবাই মিলে।

রতন একদিন এসে বলল, বাবু তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। বলছিলেন, খুব স্নেহ করতাম ওকে। পাড়াগাঁয়ে এত কষ্টে পড়ে আছে। কোনদিন ভাবি নি। এখন জানতে পেরেও বা কী করতে পারছি। বললাম, গৌরদাসের চাকরি হলে অনেকটা সুবিধে হবে। জিজ্ঞাসা করলেন, সে আসছে কই? বললাম, আসবে। একা মানুষ। সব ব্যবস্থা করে আসতে হবে তো। তাই দেরি হচ্ছে।

আর একদিন বলল, বাবু আজ তোমায় কথা বলছিলেন। তোমার হাতের রান্নার প্রশংসা করছিলেন। বলছিলেন, চমৎকার রান্নার হাত! অনেকদিন ওর হাতের রান্না খাইনি।

একদিন রাত্রে খাবার জন্য বীরেনদাকে নিমন্ত্রণ করল রতন। সে নিজের হাতে সব অতি যত্নে রান্না করল। চন্দ্রা সাহায্য করল।

রান্নার সময়ে চন্দ্রা বলল, কোথাকার কে, তার জন্যে আমরা যোড়শোপচারে রান্না করছি। গৌরদার রোজ খাওয়া জুটছে কি না কে জানে। তোর যে কী করে এ সব করতে ইচ্ছে করছে, দিদি!

সে বলল, কী করব বল্। আমারই কি ভাল লাগছে। রতনের মুখ রাখবার জন্য করা। বড়মুখ করে নেমন্তন্ন করেছে ওর বাবুকে। তা ছাড়া বাবু খুশী থাকলে ওর সুবিধে হবে।

সত্যি সেদিন গৌরদাসের জন্যে মন কেমন করছিল তার। কী করে তার দিন কাটছে কে জানে!

বীরেনদা খেতে এল রাত নটায়। মোটরে করে এল। খেতে দেওয়া হল। সে সামনে বসে খাওয়াতে লাগল। রতন দাঁড়িয়ে হাত কচলাতে লাগল।

খাওয়ার পর রতনের সঙ্গে গল্প করল কিছুক্ষণ। সে আর চন্দ্রা রান্নাঘরে গিয়ে নিজেদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগল। রতন এসে বলল, বাবু যাচ্ছেন। চন্দ্রা বলল, বেশ তো! করতে হবে কী? রতন বলল, কি আর করতে হবে—ভদ্রতা; তুমি ওসব বুঝবে না।

সে রতনের সঙ্গে গেল। বীরেনদা বাইরে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিল। জ্যোৎস্না রাত্রি ছিল। জ্যোৎস্নার আলোতে ওকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। ওর মুখের স্বাভাবিক রুক্ষ ভাব, চোখের স্বাভাবিক উগ্র দৃষ্টি—যা দিনের আলোতে চোখে এসে লাগত—জ্যোৎস্নার কোমল প্রলেপে তা ঢাকা পড়েছিল। দূর থেকে তাকে দেখে মনে হল যেন অচিন্ত্যদা দাঁড়িয়ে আছে—ঠিক তেমনই মুখ, তেমনই চোখ।

কাছে যেতেই বলল, আর একজনকেও ডাক। আমার কাছে আসতে লজ্জা কি? রাধার দাদা আমি, ওঁরও তো দাদা।

রতন গলে লুটিয়ে পড়বার উপক্রম হল। একগাল হেসে বলল, আপনার মত দাদা পাওয়া তো ভাগ্যের কথা।

চন্দ্রা বোধ হয় আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছিল। রতন যেতেই ওর সঙ্গে এল।

বীরেনদা বলল, আজ চমৎকার খেলাম। অনেক দিন এমন খাই নি। মনে হল যেন মাসীমার হাতের রান্না খাচ্ছি। তবে তার জন্য ছোট বোনদের ধন্যবাদ দিতে পারব না। আশীর্বাদ করব।—বলে গাড়ির ভিতর থেকে দুখানা শাড়ি বার করে রতনের হাতে দিয়ে বলল, বোনদের জন্যে যৎসামান্য আশীর্বাদী দিয়ে গেলাম।

বীরেনদা চলে গেল। বাড়িতে ফিরে এসে রতন বলে উঠল, খুব দামী শাড়ি দিয়েছেন! কি রকম দিল দেখেছ বাবুর। অনেক ভাগ্যে এমন মনিব পেয়েছি।

দিন কয়েক পরে রতন বলল, বাবু বললেন খুব ভাল একটা ছবি এসেছে সিনেমায়। ঠাকুর দেবতার ছবি। দেখতে যাবে কি তুমি?

ঠাকুর দেবতার নাম শুনে চন্দ্রাও লাফিয়ে উঠল। সেও যাবে বলল।

দুজনেই গিয়েছিল। ফাল্গুনের মাঝামাঝি। একটা বাদলা হয়ে গিয়েছিল কিছুদিন আগে। বাতাসে একটু শীতের আমেজ ছিল তখনও। চন্দ্রা একটা গরম শাল গায়ে দিয়েছিল। রতন সেই বছরই কিনে দিয়েছিল তাকে। সে তার রঙ-চটা চাদরটি গায়ে দিয়েছিল। গাড়ি শহরে পৌছতেই বীরেনদা বলল, তোমার চাদরটা আমাকে দাও, আমার চাদরটা তুমি নাও।

সে একটু ইতস্তত করতেই বীরেনদা জোর করে চাদরটা খুলে নিয়ে ওর শালটা তাকে পরিয়ে দিল। চন্দ্রা পাশেই বসেছিল। রতন বসেছিল সামনে। দুজনেই ব্যাপারটা দেখল। রতনের মুখে মোটেই ভাবান্তর দেখা গেল না। কিন্তু চন্দ্রার ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠলো। চোখেও একটা বাঁকা চাউনি জ্বলজ্বল করে উঠল। রাগ হল বীরেনদার উপরে। ভারী একরোখা মানুষ! আগেও এমনই করত। তার জন্যেই ভয়ে ভয়ে দূরে থাকত ওর কাছ থেকে। লজ্জাও হল। কী ভাবল চন্দ্রা, কী ভাবল রতন!

সেদিনও সে বীরেনদার পাশেই বসেছিল। সেদিনও বীরেনদা

তার একটি হাত নিজের কোলের উপর তুলে নিয়েছিল। সে টেনে নিতে সাহস করে নি। যা মানুষ, হয়তো জোর করে আবার টেনে নেবে! কিন্তু ভালও লাগছিল তার ওর দেহের সান্নিধ্য। ভাল লাগল ওর স্পর্শ। মাঝে মাঝে তার মন ছবি থেকে পিছলে পড়ছিল। ফেরবার সময়েও গাড়িতে বীরেনদার পাশেই ছিল। আজও তার খুব ঘুম পেয়েছিল। ঘুমোয় নি কিছুতে। বীরেনদা ঘুমোতে লাগল। চন্দ্রা মাঝে মাঝে ঢুলতে লাগল। রতনের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই বীরেনদার ঘুম ভাঙল।

সে বলল, শালটা—

বীরেনদা বলল, থাক্ এখন। পরে ফেরত পাঠিয়ে দিয়ো। তার শালটা বীরেনদার কোলে ছিল। ফেরত দিয়ে দিল। রতনের হাতে শাল টা পরদিনই ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল চন্দ্রা।

রতন একদিন গৌরদাসের খবর নিয়ে এল। জমিদারবাবু বৈশাখ মাস থেকে রাধা-মাধবের সেবার নূতন ব্যবস্থা করবেন। মন্দির-সংস্কার হবে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ব্যবস্থা হবে। মাটির বাড়ি ভেঙে পাকা বাড়ি হবে পুরোহিতের জন্যে। গৌরদাসের জন্যে রোজ নগদ একটি টাকার ব্যবস্থা হয়েছে। তার কাজ হবে সন্ধ্যে বেলায় জমিদারবাবু ও তাঁর গৃহিণীকে কীর্তন শোনানো। ওর কীর্তন নাকি ওদের খুব ভাল লেগেছে। গৌরদাস পুরনো বাড়িটাতেই আছে। ওইখানেই রান্না করে খাচ্ছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, আমার কথা কিছু বলল ?

বলল, ওখানেই থাকুক এখন। মনটা ভাল থাকবে। আমার তো এই অবস্থা, বাড়িটা ভেঙে দিলে কোথায় যে থাকব তার ঠিক নেই। হয়তো জমিদার বাড়ির এক পাশে পড়ে থাকতে হবে।

সে জিজ্ঞাসা করল, এখানে চাকরি করতে আসবার কথা কি হল ?

বলল, রাধা-মাধবের শ্রীচরণে যতদিন পারি থাকব। তারপর তিনি যা করাবেন, তাই করব।

সে বলল, আর আমি এই ভাবে এখানে-সেখানে পড়ে থাকব

এই তো?

রতন চুপ করে রইল।

গৌরদাসের উপরে রাগ হল তার। কী স্বার্থপর মানুষ! নিজের মন নিয়েই ব্যস্ত রইল চিরদিন। কারও মনের দিকে তাকাল না। রাধা-মাধবের পূজোতে মন তার তৃপ্তি পায়, আনন্দ পায়, তাই-ই করবে সারাজীবন ধরে। যাদের জীবন তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাদের কথা ভাববে না। রাধা-মাধবের পূজো যখন করতে পাবে না, তখন জমিদারবাবুদের কীর্তন শুনিয়েই বাকি জীবন কাটিয়ে দেবে। তার কথা ভাববে না। এমন কর্তব্য-জ্ঞানহীন আত্মসর্বস্ব লোকের উপর নির্ভর করার চেয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করা ভাল। যে তার কথা ভাবে না, সেও তার কথা আর ভাববে না। যে তার মুখের দিকে তাকায় না সেও তার মুখের দিকে আর তাকাবে না। সে যখন নিজের খেয়ালমত খুশিমত নিজের পথে চলতে চায়, সেও তাই-ই করবে।

ক্ষোভে অভিমানে এই ধরনের নানা কথা ভাবতে লাগল সে।

বীরেনদা প্রায়ই আসতে লাগল। রতন না থাকলেও বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে রতনকে ডাক দিত। গাড়ির শব্দ শুনলেই সে ওর ডাকের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকত। ডাক শুনলেই বেরিয়ে আসত। ও বলত, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও দেখি। চন্দ্রা রাগ করে বলত, ঠাণ্ডা জল আমাদের বাড়ি ছাড়া তো পাওয়া যায় না কোথাও! তাই বেচারা ছুটে আসে! সে ওর কথায় কান না দিয়ে জল নিয়ে যেত। একদিন এমনই এল। জল খেয়ে বলল, আঃ, বেশ ঠাণ্ডা।— গেলাসটা ফেরত দিয়ে বলল, তোমার গৌরদাস এল না কেন?

সে বলল, কি জানি!

বলল, এতদিন তোমাকে ছেড়ে রয়েছে কী করে? আমারই তো মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে করে। জল খাবার জন্যে এখানে ছুটে আসি ভাব নাকি তুমি? থার্মোফ্লাস্কটা দেখিয়ে বলল, এই দেখ, বরফ দেওয়া জল রয়েছে সঙ্গে।

ধীরে ধীরে তার মনের মধ্যে একটি পিপাসা জেগে উঠল। ওকেও প্রায় দেখতে ইচ্ছা করত। না এলে মন কেমন করত। গৌরদাসের কথা মনের এক কোণে অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত পড়ে থাকত।

রতন আর একদিন গৌরদাসের খবর নিয়ে এল। বলল, নতুন একটা চাকবি হয়েছে গৌবদাসেব।

চন্দ্রা লাফিয়ে উঠল : সত্যি !

সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। রতন বলল, বাধা-মাধবের বাড়িব সামনে লঙ্গবখানা বসিয়েছেন জমিদারবাবু। বাড়ির সামনে মস্ত বড় একটা চালাঘব তৈরী হয়েছে। সেখানে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে। ও-তল্লাটেব যত গবীব লোক খাচ্ছে। গৌবেব উপব এব তদারকের ভাব পড়েছে।

সে বলল, তবু ভালো, একটা কিছু কাজ কবছে। বাড়িটা কি ভাঙতে শুরু করেছে নাকি !

বতন বলল, না। তবে মন্দিবের কাজ আবম্ভ হযেছে। তাবও দেখাশুনাব ভাব গৌবদাসেব উপব।

সে জিজ্ঞাসা কবল, আমাব যাওযাব কথা কিছু বলল না ?

বতন বলল, স্পষ্ট কবে কিছু বলেনি। তবে বলল, জমিদারবাবু কিছুদিন পবেই কলকাতা যাবেন। ওকেও নিয়ে যাবেন। সেখানে তো নানা বকমেব ব্যবসা আছে ওঁদেব। তাব একটাতে ওকে কাজ দেবেন। ওব কীর্তন নাকি খুব ভাল লেগেছে ওঁদেব। বিশেষ করে জমিদাবগিন্নাব। জমিদাববাবু মত বদলালেও গিন্নী ওকে না নিয়ে গিয়ে ছাড়বেন না। ওখানে একটা কিছু থাকবাব ব্যবস্থা হলে তোমাকে নিযে যাবে।

বৈশাখ মাসেব মাঝামাঝি কলকাতা গিছল তারা। রতন বলল, বাবু যাবেন। জিজ্ঞাসা কবছিলেন, যাবে নাকি তোমরা ?

চন্দ্রা লাফাতে লাগল শুনে। তিনজনেই গিয়েছিল। একটা বড় হোটেলে ছিল। হোটেলের ম্যানেজার বীরেনদার আলাপী লোক। সে বা চন্দ্রা কেউ কলকাতা আগে দেখে নি। নাম শুনেছিল মাত্র।

জাপানীরা বোমা ফেলে গিয়েছিল মাস কয়েক আগে। অনেক লোক পালিয়েছিল শহর থেকে। সারারাত্রি তখনও ভয়ে ভয়ে থাকত সব। রাস্তার আলোগুলোর মাথায তখনও ঘোমটা টানা ছিল। তবু হকচকিয়ে গিয়েছিল তারা। মোটরে করে সারাদিন সারা শহব ঘুবে ঘুরে যা কিছু দ্রষ্টব্য দেখে বেড়াত। বীবেনদার বড় কাকার বাড়ির সামনে দিয়ে গেল একদিন। বেশ বাড়ি। অনেক টাকা রোজগাব করেছিলেন কাকাবাবু। বীরেনদাকেই সন্তানের মত মানুষ করেছিলেন তাঁরা স্বামী-স্ত্রী। নিজের ছেলের মতই স্নেহ করতেন। বীরেনদা ওর বাপ-মাব স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তা সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়েছিলেন। বীরেনদা সিনেমা-থিয়েটার দেখাল। ভাল ভাল হোটেলে খাওয়াল। চন্দ্রা খেতে চায় নি প্রথমে। পবে লোভে পড়ে রাজী হযেছিল। বড় বড দোকানে গিয়ে ভাল ভাল শাড়ি ব্লাউজ আরও কত কি জিনিস তাদের দুজনকে কিনে দিল। চন্দ্রা নিতে আপত্তি করেছিল প্রথমে। বীরেনদা বলল, দাদাব কাছে জিনিস নিতে আপত্তি করতে আছে ?

রতন গদগদ হয়ে বলল, সত্যিই তো।

রতনের স্ফূর্তির সীমা ছিল না। এত বড়লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা যতই পাকা মজবুত হয়ে উঠতে লাগল, ততই তার চোখেব সামনে ভবিষ্যতের রঙিন ছবি স্পষ্ট ও স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। মস্ত বড় কাজটাতে বাবু তাকে নেবে, মাসে মোটা মাইনে দেবে, ভবিষ্যতে হয়তো অংশীদার করবে, হয়তো ভবিষ্যতে একদিন সে স্বাধীনভাবে ব্যবসা শুরু করবে—এই সব আশা তার মনের মধ্যে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হতে লাগল। একদিন বীরেনদা কোথায় গেল কী একটা কাজে। রতন সেদিন এইসব কথা তাদের ইনিয়ে বিনিয়ে শোনাল।

রতন ও চন্দ্রা একদিন কালীঘাট গেল। তার মাথা ধরেছিল সকাল থেকে, জ্বরভাব হয়েছিল একটু। সে যায় নি। বীরেনদা তেতলার একটা ঘরে থাকত। তারা দোতলায়। বীরেনদা নেমে এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমি গেলে না ? নিজের শারীরিক অবস্থা জানাল সে।

বীরেনদা শঙ্কিত হয়ে উঠল : শরীর খুব খারাপ নাকি ? জ্বর হয়েছে ? কাছে এসে কপালে হাত দিয়ে বলল, কই, জ্বর নেই তো ! ডাক্তার ডাকব নাকি ?

সে বলল, না না, এমন কিছু নয় !

ডাক্তার ! মাথা ধরেছে বলে ! খোকা দিনের পর দিন ভুগেছে, কখনও ডাক্তার ডাকতে পারে নি। চন্দ্রা রতন টাকা দিয়েছিল বলে হুদিন ভাল ডাক্তার ডাকা হয়েছিল। না হলে খোকন তার বিনা চিকিৎসাতেই চলে যেত। হয়তো ভাল ডাক্তারের হাতে বরাবর থাকলে খোকা তার যেত না। খোকার মুখ মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে উঠল।

কী ভাবছ ? জিজ্ঞাসা করল বীরেনদা : খুব কষ্ট হচ্ছে তো শুয়ে থাক, আমি আসছি। বলে নিজের ঘরে চলে গেল। শুয়ে পড়ল সে।

বীরেনদা ফিরে এল কিছুক্ষণ পরে। হাতে একটা ছোট ওষুধের শিশি। মাথার কাছে বসে কপালে ওষুধটা ঘষে দিতে লাগল।

চোখ বুজে ছিল সে। সামান্য মাথাধরায় এত ! খোকার এত অসুখে কী করেছিল তারা ! চোখ দিয়ে জল পড়ল তার। বীরেনদা বলল, কাঁদছ কেন ? খুব কষ্ট হচ্ছে ?

সে বলল, না। খোকার কথা মনে পড়ছে।

সব কথা বীরেনদাকে বলল সে। বীরেনদা বলল, গৌরদাসের মত লোকদের সংসারে থাকা কেন ? বনে-জঙ্গলে গিয়ে বাস করলেই পারে।

অনেকক্ষণ পরে সে বীরেনদাকে বলল, আপনি তো সংসারী হন নি ?

বীরেনদা বলল, আমার মত সংসারী কে ? কত লোকের খাবার-পরবার ব্যবস্থা করতে হচ্ছে, দেখছ তো !

বিয়ে করেন নি কেন ?

বউ পছন্দ হয় নি। কাকা-কাকীমা চেষ্টার ক্রটি করেন নি। একটু চুপ করে থেকে বলল, যাকে পছন্দ হল, সংসার ও সমাজের আইনে তাকে পাবার উপায় ছিল না। বেদখল হয়ে গেছে সে।

বুকটা কেঁপে উঠল তার। বুঝতে পারল, কে সেই মেয়ে। তবু জিজ্ঞাসা করল, কে ?

বীরেনদা বলল, তুমি বুঝতে পার নি? বুঝতে চাও নি যে কখনও। জোর করে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। তুমি না বুঝেই দূরে সরে গিয়েছিলে। একটু চুপ করে থেকে বলে ফেলল, আচ্ছা রাধা, এখনও কি তুমি আমার হতে পার না?

সে বলল, ছি, ও-কথা বলবেন না, আমি একজনের স্ত্রী।

বীরেনদা বলল, তার জন্যেই তো সামলে আছি। না হলে এত-দিন কবে তোমাকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে রাখতাম।

সে চুপ করে চোখ বুজে শুয়ে রইল। কথাটার মোড় ফিরিয়ে দিল বীরেনদা। বলল, তোমাদের ওখান থেকে চলে যাচ্ছি শীগগির। একটা বড় কাজের সন্ধান পেয়েছি। চেষ্টা করব সেটার জন্যে। যদি হয়ে যায় তো তোমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাব। আর জীবনে হয়তো দেখা হবে না।

চুপ করে রইল সে। একবার তাকাল ওর মুখের দিকে। বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল বীরেনদা। জিজ্ঞাসা করল, কী ভাবছেন?

বীরেনদা বলল, কী ভাবছি? ম্লান হেসে বলল, সে তুমি জেনে কী করবে? আসল কথাটাই যখন জানতে চাও নি: একটু থেমে বলল, একটা কথা রাখবে? সে চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, চল, দুজনে কোথাও একদিন ঘুরে আসি। এর পর সুযোগ তো [illegible] আসবে না।

সে বলল, রতন চন্দ্রা কী মনে করবে? বীরেনদা বলল, ওদের বলব কাকা-কাকীমার সঙ্গে দুজনে দেখা করতে যাচ্ছি। সত্যি, ওঁরা যদি তোমাকে দেখতেন খুব আনন্দিত হতেন। ওঁরাও তোমাকে খুব স্নেহ করতেন। সে হেসে বলল, তা বলে ছেলের বউ করে ঘরে ঢোকাতেন না কোনদিন।

একদিন দুজনে বেরিয়ে গেল মোটরে করে। কলকাতা ছাড়িয়ে একটা বড় রাস্তা ধরে অনেকখানি গিয়ে একটা বাগানের মধ্যে গাড়িটা ঢুকল। বাগানের মধ্যে একটা একতলা পুরনো বাড়ি। গাড়িটা বাড়ির সামনে থামতেই একটা চাকর ছুটে এল—অবাঙালী। বীরেনদার

চেনা লোক। সেলাম করল সসম্মানে। সসম্মানে বাড়ির ভিতরে একটা বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। ঘরে ছিল একটা লম্বা টেবিল। চারপাশে অনেকগুলো চেয়ার। চাকরটি দাঁড়িয়ে বোধকরি আদেশের অপেক্ষা করতে লাগল। বীরেনদা একটা দশ টাকার নোট তার হাতে দিয়ে বলল, দুজনের খাবার ব্যবস্থা কর। সারাদিন থাকব আমরা এখানে। বিকেলে যাব—

চাকরটা চলে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল, কার বাড়ি এটা? বীরেনদা বলল, কী করে জানব। তবে এমনই ভাড়া দেয়। লোকে এখানে বেড়াতে আসে, চড়িভাতি করে। অনেকবার এসেছি আগে। চাকরটা চেনে আমাকে।

বাগানটায় বেড়াতে লাগল দুজনে। একটা পুকুর ছিল। বাঁধানো ঘাট। ঘাটে পাশাপাশি বসল দুজনে।

চাকরটা রান্না করছিল। বাগানটা সম্পূর্ণ নির্জন। মাঝে মাঝে পাখিদের ডাক ছাড়া সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

বীরেনদা বলল, আজকের দিনটি আমার অনেকদিন মনে থাকবে। এমন করে নিরিবিলিতে তোমাকে কখনও পাই নি।

নীরবে বসে রইল সে। বীরেনদা বলল, তুমি যে আমার কথা রেখেছ এর জন্যে তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আর একটি কথাও তোমাকে রাখতে হবে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল সে তার চোখের দিকে। তার চোখের উপর চোখ রেখে বীরেনদা বলল, আজকের দিনটি স্বামী-স্ত্রীর মত দুজনে বাস করতে চাই। সে বলতে গেল, সে কী! কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি তার সমস্ত সত্তাকে দুর্নিবার আকর্ষণে টানতে লাগল। বীরেনদা বলল, রাজী তো? সে বলতে গেল, না-না, ছেড়ে দাও আমাকে, বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে চল, কিন্তু অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটি দুরন্ত লোভ তার কণ্ঠস্বর চেপে ধরে রইল। বীরেনদা বলতে লাগল, মনে কর, আজকের দিনটির মত যেন জন্মান্তর হয়েছে আমাদের, এই জন্মে আমরা স্বামী-স্ত্রী হয়েছি।

সে নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। বীরেনদা বলল, কেমন! কাছে এস তা হলে—

বলেই নিজে কাছে এসে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

সে সভয়ে বলে উঠল : কেউ দেখতে পাবে যে!

বীরেনদা বলল, কেউ নেই এখানে।

খাবার পর একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়েছিল তারা। বীরেনদা আদরে আদরে অস্থির করে দিল তাকে।

বীরেনদার কতদিনের রুদ্ধ পুঞ্জিত কামনারাশি সহসা মুক্তি পেয়ে, বাঁধ-ভাঙা নদীর স্রোতের মত উন্মত্ত প্রবাহে তার বিবাহিত জীবনের সমস্ত সংস্কার, সঙ্কোচ, কত বোধ বন্ধন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

কাচামাটিতে ফিরে গিয়ে শুনল, গৌরদাস এসেছিল। রতনের দিদি বলল, এল —যেই শুনল তোমরা কলকাতায় গেছ, সঙ্গে সঙ্গে উঠল। কত বললাম, চারটি খেয়ে যাও— বলল, না যাই, আমার কাজ আছে।

সে জিজ্ঞাসা করল, কী কাজ জিজ্ঞাসা করলেন না?

দিদি বলল, স্থির হয়ে বসলে তো জিজ্ঞাসা করব। এল আর তখুনি চলে গেল। বোধ হয় রাগ হয়েছে। ওকে জিজ্ঞাসা করে যাওয়া উচিত ছিল তোমার। যা শরীর হয়েছে! কাঠির মত চেহারা, রঙটা কালচে হয়ে উঠেছে, বুকের হাড়গুলো গোনা যায়।

তার মনে কিছুই দাগ কাটছিল না। পিছলে পড়ছিল। এই কদিনের স্মৃতির সুরভি তার সমস্ত চেতনায় ঘন হয়ে উঠেছিল। কোন দিকে মন ছিল না তার। সেদিন সন্ধ্যায় বীরেনদা আসবে বলেছিল তারই জন্যে মন উন্মুখ হয়েছিল।

রতন গৌরদাসের খবর নিয়ে এল। মন্দির-সংস্কার শেষ হয়েছে। মাটির ঘর দুটো ভেঙে দালান হচ্ছে। সদাব্রত প্রতিষ্ঠা করবেন জমিদারবাবু।

সে জিজ্ঞাসা করল, ওর খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা কী?

মন্দিরের পাশে দুটি চাল-ডাল ফুটিয়ে নেয় কোন রকমে। তাই খায় দু বেলা। রাত্রে চাতালে পড়ে থাকে।

চন্দ্রা বলল, অসুখ-বিসুখ করবে যে!

রতন বলল, আসতে তো বললাম। রাজী হল না। জমিদারবাবু নাকি ওকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে চাকরি দেবেন। জমিদারবাবুর যেতে আর দেরি নাই।

সে বলল, নিয়ে যেতে আসে নি তা হলে?

রতন বলল, এমনই খবর দিতে এসেছিল যে কলকাতায় গিয়ে নিয়ে যাবে সেখানে।

সে জিজ্ঞাসা করল, আমার কলকাতা যাওয়ার কথা শুনে কী বলল?

রতন বলল, ভালই তো! দেখেশুনে এল। কলকাতায় তো থাকতে হবে, আগে দেখে রাখা ভাল।

রতন একদিন বলল, বাবুকে বললাম, দিদিকে দু-এক মাসের মধ্যেই গৌরদাস কলকাতা নিয়ে যাবে। বাবু কিছুই বললেন না।

বীরেনদার এখানের কাজ শেষ হয়ে এল। নূতন কাজ খোলা হবে। সেখানে যাবে। যাবার আগে কুলি-কামিনদের জন্যে বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করল। থিয়েটার দেখানোর ব্যবস্থা করল। কলকাতা থেকে থিয়েটার আনল বীরেনদা। তাদেরও নিমন্ত্রণ ছিল। তারা তিনজনেই গিয়েছিল। থিয়েটারের পর খাওয়া হল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে ভোর হয়ে গেল। বীরেনদা এত কাজের ভিড়েও প্রায় তার খবর নিচ্ছিল। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের দুজনকে খাওয়াল। খাওয়া-দাওয়ার পর একবার চোখের ইঙ্গিতে তাকে ডাকল।

চন্দ্রাকে একটা ঘরে বসিয়ে সে দেখা করল বীরেনদার সঙ্গে। বীরেনদা বলল, এখান থেকে তো চলে যাচ্ছি।

সে বলল, জানি। কিন্তু আমিও তো যাচ্ছি।

বীরেনদা বলল, মানে? কোথায় যাচ্ছ?

সে বলল, ওর চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে। কলকাতায় ওদের গাঁয়ের জমিদারবাবুর কাছে কাজ পেয়েছে। জমিদারবাবু একটা ছোট বাড়ি ঠিক করে দিয়েছেন। আমাকে গোছ-গাছ করে তৈরি থাকতে বলেছে। যেদিন স্থবিধে হয় এসে নিয়ে যাবে।

মুখ কালো করে বীরেনদা বলল, তাই নাকি! যাচ্ছ তো?

সে বলল, নিশ্চয়। মেয়েছেলে স্বামীর আশ্রয় ছেড়ে আর কোথায় যায়?

বীরেনদা বলল, বেশ তাই যেয়ো। ওকে লিখে দাও, ওর কষ্ট করে আর আসবার দরকার নেই। আমি তো শীগগিব কলকাতা যাচ্ছি। তোমাকে পৌঁছে দেব।

সে বলল, ঠিকানা জানবেন কী করে?

বীরেনদা বলল, রতন জমিদারবাবুর বাড়িতে গিয়ে জেনে আসবে। একটু চুপ করে থেকে বলল, কলকাতায কাছাকাছি তো থাকব, দেখা হবে মাঝে মাঝে।

সে জিজ্ঞাসা করল, খুব দূরে কোথায় যাবাব কথা ছিল—

বীরেনদা বলল, না, কাকাবাবুর শরীর খারাপ। কলকাতার কাজ আমাকেই দেখতে হবে।

দিন কয়েক পরে যাবার দিন স্থির হল। চন্দ্রা আর রতনের দিদি বাড়িতে রইল। রতনের ভাগনে বাড়িতে থেকে দেখাশুনা করবে স্থির হল। রতন সম্প্রতি তার বাবুব কাছেই থাকবে। কিছুদিন পরে বাড়ি ঠিক করে চন্দ্রাকে নিয়ে যাবে। তখন স্থবিধা হলে তু বোনে এক বাড়িতেই থাকবে।

সন্ধ্যের পর রতন ও তাকে বীরেনদার ড্রাইভার নিয়ে গেল। শেষ রাত্রে বেরুনো হবে ঠিক হয়েছিল।

তাকে বাড়িতে রেখে বীরেনদা রতনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ফিরল ঘণ্টাখানেক পরে। তুজনের মুখেই মদের গন্ধ। রতন টলতে টলতে শুয়ে পড়ল। বীরেনদারও বেশ নেশা হয়েছে বলে মনে হল।

সে বলে উঠল, মদ খেয়েছেন?

বীরেনদা বলল, খেতে হল। কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে করতে গেলাম। খাঁটি ইংরেজ। মদ খেতে দিল। খেতে হল ভদ্রতার খাতিরে।

শেষ রাত্রে যাত্রা শুরু হল। একটা বড় গাড়ি। পিছনটা ছোট ঘরের মত। পিছনে ছোট দরজা। দু পাশে জানলা। ভিতরে দু পাশে দুটো লম্বা বেঞ্চি। রতন তখন নেশার ঘোরে অচৈতন্যপ্রায়। তাকে ধরে এনে একটা বেঞ্চিতে শুইয়ে দেওয়া হল। সে শুয়ে পড়ল আর একটা বেঞ্চিতে। মাঝখানের জায়গাটায় বাক্স বিছানা নানা জিনিসপত্র রাখা হল। বীরেনদা, ড্রাইভার মনোহরলাল বসল সামনে।

গাড়ি ছুটতে লাগল। সে ভাবতে লাগল, কাল কলকাতায় পৌঁছবে। খুব সম্ভব হোটেলে উঠবে। রতন গৌরদাসকে খবর দিলে সে ওকে নিয়ে যাবে। যে বাড়িটিতে উঠবে, নিশ্চয় খুব ছোট বাড়ি। তা যেমনই হোক, কোন রকমে মাথা গুঁজে থাকতে পারবে দুজনে। তারপর ধীরে ধীরে তাদের ভাঙা সংসার আবার গড়ে উঠবে, তাদের মরণোন্মুখ ভালবাসা আবার বেঁচে উঠবে, তাদের দুটি জীবন পরস্পরকে জড়িয়ে আবার এক হয়ে যাবে। হয়তো আবার সুদিন আসবে, হয়তো তার খোকা আবার নতুন হয়ে তার কোলে ফিরে আসবে। গৌরদাসের ভালবাসায় এ' কদিনের স্মৃতি তার মন থেকে হয়তো একদিন ধুয়ে মুছে নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। ঘুম যখন ভাঙল, তখন রোদ উঠে গেছে। একটা শহরে এসে গাড়ি ঢুকল। একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বীরেনদা নেমে এসে বলল, ক্ষিদে পেয়েছে? খাবে কিছু?

সে বলল, কলকাতা গিয়ে খাব।

বীরেনদা বলল, পৌঁছুতে দেরি আছে এখনও। মুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে নাও। রতন ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। ওর খাবার সঙ্গে নিলেই হবে। নেমে এস।

বাড়িটা একটা হোটেল। সেখানে মুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে নিল, বীরেনদা, সে আর মনোহরলাল।

রতনের খাবার নেওয়া হল।

বীরেনদা এবার গাড়ির ভিতরে তার পাশে বসল। গাড়ি চলতে শুরু করল। বীরেনদা কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, একটা কথা তোমাকে বলা হয় নি।

সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

বীরেনদা বলল, আমরা কলকাতায় যাচ্ছি না।

সে শান্তকণ্ঠে বলল, কোথায় যাচ্ছেন?

বীরেনদার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। বিজয়ীর হাসি নয়—বিজিতের হাসি। বলল, চলেছি পশ্চিমে। শহর থেকে শহরে যেখানে কাজ পাব করব। কোথাও বাসা বাধব না। আর ফিরবও না।

সে চুপ করে বসে রইল। বীরেনদা নিরাশ হল সম্ভবত। আশা করেছিল, সে ভয় পাবে, উত্তেজিত হয়ে হৈ-চৈ বাধিয়ে বসবে বা কান্নাকাটি করবে। কিন্তু কিছুই করল না। সে শান্ত স্তব্ধ হয়ে বসে থেকে মনের দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল, যেখানে আজ কদিন ধরে গৌরদাসের সঙ্গে সামান্য কিন্তু পরিচ্ছন্ন সংসার বাঁধার আশার ক্ষীণ তারাটি উঠেছিল। সেই তারাটি তার চোখের সামনেই অস্ত গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিগন্তে আর একটি আশার উদয়াভাস স্পষ্ট হয়ে উঠল। এই আশাটি অলক্ষ্যে দিগন্তের তলে অপেক্ষা করছিল। মনের তা অজানা ছিল না। বিদায়ের ব্যথা ও আগমনের আনন্দ—দুই-ই কিন্তু মনকে স্পর্শ করল না। বীরেনদা বলতে লাগল, কাকা এখানের কাজের ব্যবস্থা করে ওঁর কাছে যেতে লিখেছেন—এ কথা মিথ্যে নয়। ব্যবস্থাও করেছিলাম। যাবার জন্যে প্রস্তুতও হয়েছিলাম। কিন্তু কাল যখন তুমি তোমার স্বামীর কাছে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে এলে, তোমার মুখে বিষাদের লেশমাত্র আভাস দেখলাম না. আমাকে না পাওয়া, আমার কাছ ছেড়ে যাওয়া তোমার

মুখে তিলমাত্র ছায়াপাত করল না, তখনই স্থির করলাম, কাকার কাছে যাব না। টাকাকড়ি মান-সম্মান কিছুই চাইব না—যা তোমার ভোগে না লাগবে। যে ঘরে তুমি থাকবে না, সে ঘর বাঁধব না। যে সংসারে সমাজে আমার পাশে তোমার স্থান নেই—সে সংসার সে সমাজ আমি কোনদিন চাইব না। পথেই যদি তোমাকে চিরদিনের মত পাশে পাই, পথে পথেই ঘুরব আমরা।

আরও কত কী বলতে লাগল বীরেনদা। কানে গেল না। অনেকক্ষণ পরে চুপ করল। সে জিজ্ঞাসা করল, রতন জানে এ কথা?

বীরেনদা বলল, না। জানলেও ভয় নেই। ওকেও ফিরতে দেব না। টাকা পেলে ও ফিরতে চাইবে না।

সে বলে উঠল, সে কী! চন্দ্রার কি হবে?

বীরেনদা বলল, কার কি হবে ভাববার মত মনের অবস্থা আমার নয়। কাকা-কাকীমার কি হবে তাও কি ভেবেছি আমি? একটু থেমে বলল, যা হবার হবে

পথে জীবন কাটতে লাগল রাধার দিনের পর দিন। সারাদিন জানালার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকত। চোখের সামনে দিয়ে দ্রুতবেগে পার হয়ে যেত দিগন্তবিস্তৃত মাঠ প্রান্তর বনভূমি, দিগন্তশায়ী গিরিশ্রেণী, এখানে সেখানে দূরে-দূরে ছোট-ছোট গ্রাম। কখনও দেখতে পেত, মাঠে চাষীরা কাজ করছে, গোচারণের মাঠে গরু ছাগল ভেড়া চরছে, রাখাল বালকের দল খেলা করছে, মাঠের আল-পথ ধরে মেয়ে-পুরুষ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিজেদের ঘরে চলেছে। রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় কতকগুলো লোক মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-মেয়ে মোট-পুঁটলি চারিদিকে ছড়িয়ে দুদণ্ডের জন্য সংসার পেতেছে। তার নিজের ঘরটির কথা মনে পড়ত, তার জন্যে মন কেমন করত মাঝে মাঝে। ছোট ভাঙা ঘর। তবু সুখ-দুঃখ মেশানো জীবনের কতকটা তো ছড়ানো ছিল সেখানে! সেই জীবনটাকে সে কি ভালবাসত? ভালবাসত বইকি। যেন শান্ত পুকুরের জলে

স্নান। শান্ত, স্নিগ্ধ, স্থির। এ জীবনের মত উদ্দাম উত্তাল তরঙ্গময় নয়। তীব্র মদের মত সর্বচেতনাহারা সর্বদেহ শিথিল করা নয়। এমন অসহ্য আনন্দ ছিল না তাতে। তৃপ্তি ছিল। এ জীবনে তা ছিল না। পিপাসা বেড়েই চলেছিল দিন দিন। ভয় হত কতদিন চলবে, কতদিন পাববে সহ্য কবতে।

কাশীতে গিয়েছিল তাবা। বিশ্বনাথেব মন্দিবে গিয়েছিল। বীবেনদা দুটো মালা কিনেছিল। পাণ্ডাকে দিয়ে তাদের নামে পূজো কবাল। প্রসাদী মালা দুটি নিয়ে তাকে একান্তে ডেকে একটি মালা তাব হাতে দিয়ে বলল, আমাকে পবিয়ে দাও। তাব হাতেব মালা তাব গলায় পবিয়ে দিল। বলল, বিয়ে হল আমাদেব। এখন থেকে দেহ-মনে একান্তভাবে তুমি আমাব, আমিও তোমাব।

কাশীতে মাসখানেক ছিল তাবা। যে বাড়িতে থাকত, তাব নিচেব তলায় একজন বৃদ্ধা থাকতেন। জিজ্ঞাসা কবলেন একদিন, কতদিন বিয়ে হয়েছে?

সে বলল, দশ বাব বছব।

ছেলেপিলে হয় নি এখনও?

না।

বিশ্বনাথেব কাছে মানত কব। হবে।

কাশীতে বতনেব হঠাৎ কলেবা হল। হাসপাতালে মাবা গেল। বীবেনদা বলল, বাঁচা গেল। এবপব দুজনে বেপবোয়া প্রেম-সমুদ্রে সাঁতাব কাটা যাবে।

এমনই কবে চলল যাযাবব জীবন। মাঝে মাঝে ছোটখাটো কাজ দু-একটা জুটতে লাগল বড বড কনট্রাক্টবদেব অধীনে। একবাব একটা তাঁবুতে মাস দুই কাটাতে হল। কত শহবে ঘুবল। কত হোটেলে কাটাল। কত লোকেব সঙ্গে পবিচয় হল। গৌবদাসেব সঙ্গে তার সেই পল্লী-জীবনেব স্মৃতি গত জন্মেব স্মৃতিব মত অতি অস্পষ্ট হয়ে উঠল।

এমনই করে কাটল প্রায় তিন বছব। একটা শহব থেকে দূববর্তী

আর একটা শহরে চলেছিল তারা। একটা চাকরির সন্ধান পেয়েছিল বীরেনদা। ওর হাতের টাকা সব ফুরিয়ে এসেছিল। মনোহরলালের মাইনে বাকি ছিল অনেক মাসের। বীরেনদা ঠিক করল, চাকরি করবে। মোটরটা বিক্রি করে মনোহরলালের মাইনে শোধ করে দিয়ে ওকে বিদায় দেবে। তারপর দুজনে স্থির হয়ে বসে সংসার করবে।

সামনে মনোহরলাল ও বীরেনদা বসে ছিল। বীরেনদা গাড়ি চালাচ্ছিল। ঝড়ের বেগে গাড়ি চলছিল। হঠাৎ একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেল। তারপর কী হল সে জানে না।

যখন জ্ঞান হল তখন সে এক হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে, পায়ে হাতে মাথায় ব্যাণ্ডেজ।

পরে সব শুনল। মনোহরলাল সঙ্গে সঙ্গে মারা গিয়েছিল। বীরেনদা কিছুক্ষণ বেঁচেছিল।

সেরে উঠল মাসখানেক ভুগে। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু বাঙালী ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাবে?

সে গ্রামের নাম বলল। ডাক্তারবাবু কিছু টাকা দিলেন তাকে। ট্রেনে উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

ফিরল দেশের দিকে। কোথায় যাবে। গাঁয়ে আর ফেরবার পথ ছিল না। গৌরদাসের কাছে ফেরবার মুখ ছিল না আর। চন্দ্রার কাছেও ফেরা অসম্ভব। কোথায় যাবে তা হলে। ভেবে কোন কূল-কিনারা পেল না। বীরেনদার কথা মনে পড়ত প্রায়। ওর উদ্দাম ভালবাসার কথা। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত তাকে আছড়ে ফেলে নির্মম পীড়নে পেষণে রুদ্ধশ্বাস করে ছাড়ত। ওকে ভুলবে না কোনদিন। দুঃসহ পীড়নের মধ্যে যে তীব্র আনন্দের আস্বাদ সে পেয়েছিল, তা সহজে ভোলবার নয়। ভাবত, হয়তো ভাল হয়েছে। হয়তো ওর নেশা কেটে যেত একদিন, হয়তো ভারের মত অনিচ্ছা সত্ত্বেও টেনে নিয়ে বেড়াত, হয়তো একদিন ফেলে দিত পথের মাঝে। সেই মর্মান্তিক বেদনা, দুঃসহ অপমানের দিন আসবার আগেই প্রেম-

নাট্যে যবনিকা পড়েছে। ভালই হয়েছে। তবু উল্কার মত যে তার জীবনকে ক্ষণেকের জন্য উদ্ভাসিত করে দিয়ে অন্তর্হিত হয়েছে, তার কথা তার অন্তরে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

এক পাশে জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তার সারা জীবনটা তার চোখেব সামনে ঘুরতে থাকল। মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা। বাবা মাসীমা দাদা আর অচিন্ত্য অপূর্ব অনাদিদাদের কথা। কত ঘটনার, হাসি-কান্নাব, আনন্দ-বেদনার কথা। কাঁচামাটির কথা—গৌবদাসের গ্রামের কথাও মনে পড়ল। ভাবল গৌরদাস কী কবছে! চন্দ্রা কোথায় আছে! চন্দ্রা হয়তো গৌরদাসেব সংসার করছে! তাই তো চাইত চন্দ্রা। রতনের উপর বিন্দুমাত্র ভালবাসা ছিল না। রতনেব বিবহে সে অধীর হয় নি মোটেই। গৌরদাসের কাছে থাকতে পেয়ে সে হয়তো কৃতার্থ হয়ে গেছে।

একটা বড় স্টেশনে গাড়ি দাড়াল। থামল অনেকক্ষণ। অনেক লোক উঠল। জনকয়েক বাঙালী। একজন পুরুষ দুজন মেয়ে। পুরুষটি বয়স্ক। ষাটের কাছাকাছি বয়স। রঙ ফরসা। দশাসই চেহারা। মুখে চাপ-দাড়ি, মাথার লম্বা চুল ঘাড়ে লুটোচ্ছিল। গলায় মালা—ভক্ত লোক। পরনে বেশমী ধুতি, বেশমী লম্বা ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবি, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো। মেয়ে দুটিব মধ্যে একজন প্রৌঢ়া। মোটা-সোটা, মেটে-মেটে রঙ। দামী শাড়ি পবনে। গায়ে এক-গা গয়না। এরও গলায় তুলসীর মালা। পুরুষটিব পাশে বসল। অন্য মেয়েটি তারই সমবয়সী। পরনে সাধাবণ শাড়ি। এসে তার কাছাকাছি বসল। দেখে মনে হল মেয়েটি ওদের দাসী।

বাঙালী নবাগতরা, বিশেষ করে মেয়েটি তার দিকে তাকাতে লাগল ঘন ঘন। বাংলা দেশের বাইরে বাঙালীদের মধ্যে একটা টান থাকে। —এ' কদিনের জীবনে সে বুঝতে পেরেছিল। দু-চারটে স্টেশনের পরে মেয়েটি তার কাছে এসে বসল। শ্যাম-বর্ণ মেয়েটি। লম্বা ছিপছিপে গঠন। মুখ-চোখ গড়ন মন্দ নয়। জিজ্ঞাসা করল,

কোত্থেকে আসছেন ?

সে বলল, জানি না।

জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছেন ?

সে বলল, জানি না।

বিস্ময়ের স্বরে মেয়েটি বলল, মানে ?

বলল, মানে ! শুনবেন ? অজানা লোকের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। লোকটি ছেড়ে চলে গেছে। ঘরের পথ খোলা নেই।

বুঝল মেয়েটি। জানাল, তারও একদিন এই রকমই ঘটেছিল। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল। দোজবর পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বড় বড় ছেলে মেয়ে। স্বামী মারা গেলে ছেলেরা বাড়িতে ঠাঁই দিতে চাইল না। শেষে এক ভদ্রলোকের রাঁধুনি হিসেবে কলকাতায় এল। ভদ্রলোক বিশেষ স্নেহ দেখাতে শুরু করলেন। শেষে বিরক্ত হয়ে গিন্নীকে সব জানিয়ে দিল। গিন্নী কর্তাকে শায়েস্তা করলেন কিন্তু তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। গঙ্গায় ডুবে মরবে স্থির করল। গঙ্গার ঘাটে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল। সে তাকে নিরাপদ আশ্রয় জুটিয়ে দিল। তবে--

থেমে গেলে সে জিজ্ঞাসা করল, তবে কি ?

মেয়েটি বলল, মূল্য দিতে হল অনেক—দেহটা দিতে হল।

মেয়েটির নাম মালতী। সব পরিচয় দিল সে। ভদ্রলোকের নাম রাসবিহারী মল্লিক। কলকাতায় বাড়ি। কোন এক হোটেলের মালিক। প্রৌঢ়ার নাম ক্ষীরোদবাসিনী। ভদ্রলোকের স্ত্রী নয়—রক্ষিতা। সে জিজ্ঞাসা করল, হোটেল কি বন্ধ আছে ?

মালতী বলল, না। ম্যানেজারবাবু আছেন কলকাতায়। তিনি চালাচ্ছেন।

আশ্রয় পেল ওখানে। একই মূল্য দিতে হল তাকে। নিরুপায়ে রাজী হতে হল। প্রথম প্রথম মন রাজী হত না। অভ্যাস হয়ে এল ক্রমে ক্রমে।

বৎসর ছুই কাটল।

একদিন গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়ে গেল অচিন্ত্যদার সঙ্গে। কোন এক বন্ধুর মায়ের সৎকার করতে এসেছিল। স্নান করছিল গঙ্গার ঘাটে। মালতী বলল, বেশ সুন্দর চেহারাটি, তাই না?

সে লক্ষ্য করে নি আগে। মালতীর কথায় ওদিকে তাকাতেই আশ্চর্য হয়ে গেল। অচিন্ত্যদা যে! আরও লম্বা হয়েছে, মোটা হয়েছে, ফরসা হয়েছে। মুখখানা আরও সুন্দর হয়েছে।

মালতী বলল, কি, ধ্যানস্থ হয়ে গেলি যে!

সে বলল, আমার অচিন্ত্যদা। আমাকে চিনত। এখন কি চিনতে পারবে? আমার এই অবস্থায় পরিচয় দেওয়া উচিত নয়।

হঠাৎ অচিন্ত্যদা তাকাল তাদের দিকে। তাকে দেখল। তার চোখে ফুটে উঠল বিস্ময়। উঠে এসে অচিন্ত্যদা বলল, তুমি রাধা না?

লজ্জায় জড়সড় হয়ে মাথা নিচু করে সে কোন মতে বলল, হাঁ।

আবার জিজ্ঞাসা করল, কোথায় থাক?

চুপ করে রইল সে।

জিজ্ঞাসা করল, বিয়ে হয় নি এখনও?

সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছিল সে। ঘাড় নেড়ে জানাল, হয়েছিল।

বিধবা হয়েছ বুঝি?

চুপ করে রইল সে। অচিন্ত্যদা যে কিছুই শোনে নি, কিছুই জানে না বুঝতে পারল সে।

আবার জিজ্ঞাসা করল, কোথায় থাক বললে না?

মালতী জবাব দিল। বলল, আমরা দুজন একটা হোটেলে ঝিয়ের কাজ করি।

ঝিয়ের কাজ! পরম বিস্ময় ফুটে উঠল অচিন্ত্যদার চোখে-মুখে। তারপরই বিষাদের ছায়া নামল। ব্যথাভরা স্বরে বলল, ঝিয়ের কাজ করছ? দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। মালতী তাদের ঠিকানা জানিয়ে দিতেই বলল, আমি দেখা করব একদিন, যত শীঘ্র পারি। বাড়ি যাও।

বন্ধুদের সঙ্গে চলে গেল অচিন্ত্যদা।

এক মাস কেটে গেল। অচিন্ত্যদা এল না। মালতী মাঝে মাঝে ঠাট্টা করত, কিরে, তোর নাগরের দেখা নেই যে! সে বলত, ছি, ও কথা বলো না। আমার দাদা। মনে মনে বলত, আমার দেবতা।

একদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিল তারা। সিনেমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা ঝকঝকে নতুন গাড়ি এসে দাঁড়াল। নামল ধীরেনদা। সাহেবী পোশাক পরনে। সঙ্গে বাইশ-তেইশ বছরের একটি মেয়ে। খুব সুন্দরী। চোখ ফেরানো যায় না এমনই রূপ। তারও সাজ-সজ্জার বাহার খুব। ধীরেনদা ও মেয়েটি তাদের দিকে তাকাল না। ওরা সিনেমার মধ্যে ঢুকে গেল।

একজন ধনী মক্কেল ছিল মল্লিকমশায়ের। মাঝে মাঝে সস্ত্রীক হোটেলে এসে থাকত। বাঙালী নয়—বেহারী। মহাবীর তেওয়ারী নাম। স্ত্রী চিররুগ্না। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্যই আসত। তাদের সেবার ভার এবার পড়ল তার উপরে। খুব পছন্দ হল তাকে। তারও পছন্দ হযেছিল মানুষ দুটিকে। তেওযারীর স্ত্রী তো বিছানাতে শুয়েই থাকত দিনরাত। স্ত্রীর সেবার জন্য একজন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন ছিল তার। তাকে নিতে চাইল। মল্লিকমশায় অনেক টাকা নিয়ে বিক্রি করে দিলেন তাকে।

তেওয়ারীর সঙ্গে চলে এল সে।

এখানে কাঠের গোলা ছিল তেওয়ারীব। কিন্তু এখানে থাকত না সে। শহবে চালের আড়ত খুলেছিল। ওইখানেই থাকত। এখানের কারবার দেখতেন রাখালবাবু। সামনের গ্রামটার পিছনেই আর একটা গ্রাম আছে—সেখানে বাড়ি। থাকতেন গোলাতেই, সেখানেই খাওযাদাওয়া করতেন। বাড়িতে থাকত তেওয়ারীর স্ত্রী আর তার পিতৃমাতৃহীন ভাইপো ব্রজলাল। তাকেই সে মানুষ করেছিল শিশুকাল থেকে। তাদের নিজেদের সন্তান হয় নি। ব্রজলালই সন্তানের স্থান অধিকার করেছিল। সে যখন এল ব্রজলালের বয়স সতেব-আঠার বছব রাখালবাবুদের গ্রামে একটা হাই স্কুল ছিল, সেখানে সে পড়ত। রাখালবাবুর ছেলে বিশ্বনাথও পড়ত সেখানে

ওরই সঙ্গে। দুজনে খুব ভাব ছিল। বিশ্বনাথ প্রায়ই তাদের এখানে আসত। বাড়ির ঝি বলেই জানত তাকে। তবে খারাপ ব্যবহার করত না কখনও। তাকে দিদি বলে ডাকত। ব্রজলাল বড় উদ্ধত প্রকৃতির ছিল। দুর্ব্যবহার করত তার সঙ্গে।

তেওয়ারীর স্ত্রী তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত। সেও তার খুব সেবা করেছিল। তেওয়ারী বাড়ি এলে তাঁর কাছে খুব প্রশংসা করত। বলত, নিজের মেয়ের মত সেবা করে। আমি মরে গেলেও তুমি ওকে ফেলে দিয়ো না। তেওয়ারীও তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত। সে যে ওদের নিজের লোক নয়, ক্রীতদাসী মাত্র—কোনদিন বাক্যে বা ব্যবহারে তা বুঝতে দিত না। ব্রজলালের দুর্ব্যবহার চোখে পড়লে তিরস্কার করত। ফলে ব্রজলাল আরও দুর্ব্যবহার করত তার সঙ্গে।

বছর সাত কাটল। ব্রজলাল বার দুই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফেল করে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে কাঠের ব্যবসায়ে ঢুকে পড়ল। রাখালবাবু বৃদ্ধ হয়েছিলেন। কাজকর্ম করবার ক্ষমতা ছিল না। ব্রজলালই সব দেখাশুনা করত। রাখালবাবু হিসেব-পত্র দেখতেন। তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ ডাক্তারী পাস করে একটা কলিয়ারিতে ডাক্তারী করতে লাগল। বিশ্বনাথ রোজ তেওয়ারীর স্ত্রীকে দেখত আসত। ডাক্তারী পাস করে যেদিন দেখা করতে এল, তাকে বলল, কি দিদি, কেমন আছ?—সে বলল, আমার আর থাকাথাকি কি ভাই! বেঁচে আছি কোন রকমে। তুমি তো ডাক্তার হয়ে এলে?

বিশ্বনাথ বলল, হ্যাঁ দিদি। কাছেই একটা চাকরি পেয়েছি। এবার রোজ দেখা হবে।—সে বলল, ভালই হয়েছে ভাই। তবে ব্রজলালের উপর একটু দৃষ্টি রেখ, কী যে করে বেড়াচ্ছে, কে জানে! গিন্নীকে বলে লাভ নেই। কর্তাকে বললে ফল কিছু হবে না, লাভের মধ্যে আমাকে মার খেয়ে মরতে হবে।

মার! চমকে উঠল বিশ্বনাথ: বল কি?

সে বলল, যদি চুপ করে থাকি তো কিছু বলে না। বলতে গেলেই

বিপদ। না বলেই বা থাকি কী করে? মদ খেয়ে বেলেল্লাগিরি করবে, মেয়েমানুষ ঘরে নিয়ে আসবে, তা সহ্য করি কী করে?

বিশ্বনাথ বলল, বল কি, এতদূর নেমেছে! কিছুই তো জানতাম না! এখনই তো দেখা হল। কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হল না। আচ্ছা, আমি লক্ষ্য রাখব।

বিশ্বনাথ আসবার পর ব্রজলালের অনেকটা পরিবর্তন হল।

তেওয়ারী-গিন্নীর অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগল। বিশ্বনাথই চিকিৎসা করত আজকাল। দিন দু বেলা দেখে যেত। তেওয়ারীও প্রায় এসে দেখে যেত।

কাছাকাছি একটা কলিয়ারিতে শ্রমিকরা ধর্মঘট করল। মজুরি বাড়াতে হবে—এই দাবি করে। বিশ্বনাথ যে কলিয়ারিতে চাকুরি করে তার কাছেই কলিয়ারিটা। সন্ধ্যের পর বিশ্বনাথ ব্রজলালের ঘরে তার সঙ্গে বসে গল্প করছিল। ব্রজলাল কাছাকাছি সব কলিয়ারিতে কাঠ সরবরাহ করত। ওর হামেশা যাওয়া-আসা ছিল ওই সব কলিয়ারিতে। প্রত্যেকটি কলিয়ারির কর্তাদের নাম, কর্মচারিদের নাম, তার নখাগ্রে ছিল। দুজনে নানা রকম আলোচনা করছিল। পাশের ঘরে তেওয়ারী-গিন্নীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে রাধা সব শুনতে পাচ্ছিল। বিশ্বনাথ বলছিল, অনাদিবাবু তো আজ আসছেন, তিনি কলিয়ারির মালিকের সঙ্গে দেখা করবেন। যদি তাঁর প্রস্তাব মত মালিক কাজ করে ভাল, না হলে ধর্মঘট চলতে থাকবে। সব কলিয়ারির মজুরদের মধ্যেই অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। জিনিসপত্রের দাম চারগুণ চড়েছে। অথচ শ্রমিকের মজুরি আগের মতই থাকবে আর মজুরদের পেট মেরে মালিক আর নবওয়ালা-ঝুনঝুনওয়ালার দলের মোটা পেট আরও মোটা হবে, তা আমাদের স্বদেশী সরকার সহ্য করতে পারেন, কিন্তু দেশবাসীর প্রকৃত কল্যাণকামী যাঁরা, তাঁরা সহ্য করবেন না। অনাদিবাবু দেশের শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণের জন্য আত্মনিয়োগ করেছেন। ভাল ছেলে ছিলেন, প্রথম শ্রেণীর এম-এ। ভাল ঘরের ছেলে। ওঁর দাদা ডাক্তার এ, কে, দাস। নামজাদা ডাক্তার।

সহজেই বড় সরকারী চাকরিতে ঢুকে সুখে-স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারতেন কিন্তু তা করেন নি। সংসারের সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছেড়ে দীন-মজুরদের জীবন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন।

লম্বা বক্তৃতা দিল বিশ্বনাথ। শুনতে শুনতে শুধু এই প্রশ্নই জাগতে লাগল তার মনে—অনাদিবাবু কে? তার অনাদিদা নাকি! দাদা বড় ডাক্তার—ডাক্তার এ, কে, দাস! অচিন্ত্যকুমার দাস? কে জানে!

দিন কয়েক পর। সেদিন সন্ধ্যের পর বিশ্বনাথ এল না, ব্রজলালও বাড়ি ফিরল না। বাড়ির ঠাকর-চাকর দুজনেই বলতে লাগল, গুলী চলেছে কলিয়ারিতে। অনেক লোক মারা গেছে।

এরা এল না কেন! ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল তার। ব্রজলাল তার প্রতি যতই দুর্ব্যবহার করুক, সে তাকে স্নেহ করত।

রাত বারোটা বাজল। সে তার ঘরে বসে ঢুলছিল। ব্রজলালের ডাক শুনে ঘুম ভাঙল। ধড়মড় করে বেরিয়ে দেখল, ঠাকুর দরজা খুলে দিয়েছে। বিশ্বনাথ আর ব্রজলাল একজনকে ধরে ধরে নিয়ে এসে ব্রজলালের বিছানায় শোয়াচ্ছে। ঠাকুর একটা লণ্ঠন জ্বেলে নিয়ে এল। সেও ঠাকুরের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকে বিশ্বনাথের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ব্রজলাল ধমক দিল, এখানে কী করছ, যাও। বিশ্বনাথ তাকে নিরস্ত করল। সে চুপি চুপি বিশ্বনাথকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে?—বিশ্বনাথ বলল, গুলী লেগেছে।

লণ্ঠনের মৃদু আলোতে শয্যায় শায়িত লোকটিতে দেখতে লাগল সে। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। মুখখানি লম্বাটে। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যাম। মাথায় এলোমেলো বড় বড় চুল। গোঁফদাড়ি কামানো। পরনে পা-জামা ও পাঞ্জাবি। মুখে অসহ্য যন্ত্রণার চিহ্ন পরিস্ফুট। মুখ বুজে অপরিসীম যন্ত্রণা সহ্য করছেন বুঝতে দেরি হল না। চোখ দুটি মুদ্রিত।

প্রথমটা চিনতে অসুবিধা হলেও একটু এগিয়ে যেতেই আর চিনতে দেরি হল না—তার অনাদিদা। বিশ্বনাথ বলল, কী দেখছ?

জিজ্ঞাসা করল, এঁর নাম কি ?

বিশ্বনাথ বলল, ইনিই অনাদিবাবু।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলে উঠল, আমার অনাদিদা!

বিশ্বনাথ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, সে কী! এঁর সঙ্গে পরিচয় আছে তোমার ?

ব্রজলাল শুনতে পেয়ে বলল, কী বলছে ?

বিশ্বনাথ বলল, অনাদিবাবুর সঙ্গে দিদির পরিচয় আছে।

ব্রজলাল অবজ্ঞার হাসি হেসে বলল, ওর কথা ছেড়ে দাও।

সে বলল, উনি কি ঘুমোচ্ছেন ?

বিশ্বনাথ বলল, না, ডাকব ? বলে সে অনাদিবাবুকে ডাকল। অনাদিদা ধীরে ধীরে চোখ খুলল।

বিশ্বনাথ বলল, একে চেনেন ?

অনাদিদা ক্লান্ত চোখ দুটি মেলে তার দিকে তাকাল। মনে হল যেন কুয়াশা নেমেছে ওর চোখের সামনে। কুয়াশার ভিতর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করছে।

সে বলল, অনাদিদা, চিনতে পারছ না ?

কুয়াশা কেটে গেল। চোখের দৃষ্টিতে চেনার ভাব জেগে উঠল। ধীরে ধীরে বলল, তুমি কি রাধা ?

সে বলল, হ্যাঁ।

এখানে এলে কী করে ?

সে বলল, দুর্ভাগ্যের স্রোতে ভাসতে ভাসতে, ঘাটে-অঘাটে ভিড়তে ভিড়তে এখানে এসে উঠেছি দাদা।

চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর তার ক্লান্ত চোখ দুটি বুজে এল।

শেষরাত্রে একটা মোটরে করে বিশ্বনাথ অনাদিদাকে কলকাতায় পৌঁছে দিল। ফিরে এল পরদিনই। দেখা করল তার সঙ্গে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বলল, দিদি, না জেনে হয়তো অসম্মান করেছি আপনার। ক্ষমা করুন। সে তাকে আশীর্বাদ

করল। অনাদিদা তার সম্বন্ধে যতটা জানতেন তাকে জানিয়েছিলেন। অনাদিদার কথা জিজ্ঞাসা করতে বলল, ডাঃ দাসের কাছে পৌঁছে দিলাম, তিনি ব্যবস্থা করবেন। ডাঃ দাসকে চিনতেন ?

সে বলল, আমার অচিন্ত্যদা।

বিশ্বনাথ বলল, খুব বড় ডাক্তার। কলকাতায় খুব নাম। আমাদের স্কুলে পড়াতেন। এখন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক।

সেদিন থেকে তার প্রতি ব্রজলালের অবজ্ঞার ভাবটা একটু কমল মনে হল।

তেওয়ারী-গিন্নী মারা গেল। তারপরই তেওয়ারী অসুখে পড়ল। যকৃৎ-সংক্রান্ত অসুখ। শহরের ডাক্তাররা দেখেছিল। কোন ফল হয় নি। দিন দিন অসুখ বাড়তে লাগল। চলে এল শহর থেকে এখানে। রাখালবাবু শহরে গিয়ে আড়তের কাজ দেখতে লাগলেন। বিশ্বনাথ দেখতে এল। সব শুনে তাকে বলল, রোগটা ভাল মনে হচ্ছে না দিদি। কলকাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত। অনেক টাকা খরচের ব্যাপার।

শহরের এক বড় মাড়োয়ারীর কাছে চালের আড়তটা বিক্রি করে দিয়ে টাকার ব্যবস্থা হল। তারপর তেওয়ারীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে গেল সে, বিশ্বনাথ ও ব্রজলাল। মল্লিক মশায়ের হোটেলেই ওঠা হল। হোটেলের মালিক বদল হয়েছিল। ম্যানেজারবাবু কিন্তু তখনও টিকে ছিলেন। তাকে চিনতে পারলেন। মালতীর কথা সে জিজ্ঞাসা করল। বললেন, মল্লিকমশায় মারা যাবার পরই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।

অচিন্ত্যদাকে ডেকে আনল বিশ্বনাথ। অচিন্ত্যদা রোগী দেখে গম্ভীর হল। শক্ত রোগ। সে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ অচিন্ত্যদার চোখ পড়ল তার উপর। বললেন তোমার নাম রাধা, না ?

সে ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

অচিন্ত্যদা বললেন, অনাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল তোমার, অনাদি বলছিল।

সে জিজ্ঞাসা করল, অনাদিদা কেমন আছে ?

বিশ্বনাথও ওই প্রশ্ন করল।

অচিন্ত্যদার মুখ গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। বললেন, মারা গেছে।

বিশ্বনাথ ও ব্রজলাল চলে এল। সে তেওয়ারীর কাছে থেকে তার সেবা করতে লাগল। প্রায় বৎসরখানেক থাকতে হল।

অচিন্ত্যদা রোজ আসতেন। প্রথমটা তার নির্দিষ্ট ফী নিতেন। চিকিৎসা চলতে লাগল। উন্নতি হল না কিছুই। অচিন্ত্যদা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। আরও বড় বড় ডাক্তারদের ডেকে পরামর্শ করলেন। করণীয় যা কিছু করতে বাকী রাখলেন না। অনেক খরচ হতে লাগল। বাড়িটা বাঁধা দেওয়া হল।

দিন দিন তেওয়ারীর অবস্থা মৃত্যুর দিকে গড়িয়ে চলল। পেটে জল জমে উঠল। দেহ অস্থিচর্মসার ও হলদে হয়ে উঠল। দিনরাত পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করত সে প্রাণপণ সেবা করেছিল। সবসময় কাছে কাছে থাকত। মাঝে মাঝে তেওয়ারী বলত, তুই আমার বেটী। তোর সেবা আমি ভুলব না।

অচিন্ত্যদার রোগী দেখা হয়ে গেলে রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার ঘরে বসতেন। নেহাত ছোট একটি ঘর। একটা চৌকিতে তার সামান্য বিছানাটি পাতা থাকত। অচিন্ত্যদা এসে বসতেন তার উপরে। সে চা এনে হাতে দিত। অচিন্ত্যদা চা খেতে খেতে গল্প করতেন।

অচিন্ত্যদাকে তার জীবনের সমস্ত খবর জানাল। বীরেনদার কথাও বাদ দেয় নি। অচিন্ত্যদা নীরবে গম্ভীর-মুখে সব শুনলেন। কিছুই বললেন না। চুপ করে কী ভাবতে লাগলেন। কী ভাবছিলেন, কে জানে! একদিন তাঁর জীবনের সঙ্গে এই দুর্ভাগিনী মেয়েটার জীবন মিশে যাবার সম্ভাবনা হয়েছিল—মনে পড়ল বোধ-হয়। একদিন অচিন্ত্যদাকে জিজ্ঞাসা করল, সেবার দেখা করতে

আসবেন বলেছিলেন। কই এলেন না তো?

অচিন্ত্যদা ভারী গলায় বললেন, উপায় ছিল না মোটেই। বাবা হঠাৎ অসুখে পড়ে গেলেন। রক্তের চাপ অত্যন্ত বেশী ছিল। কোর্টে গিয়েছিলেন, সেখানে রোগের আক্রমণ হল। বাড়িতে আনা হল। এক মাস যমের সঙ্গে টানাটানি করলাম। রাখতে পারলাম না।

একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, বউদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন না।

অচিন্ত্যদা বললেন, সে তো এখানে থাকে না।

কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় থাকেন?

অচিন্ত্যদা বললেন, বিলেতে।

অচিন্ত্যদার বিয়ের ইতিহাস বললেন একদিন। বিলেতে পড়তে গিয়েছিলেন। যে বাড়িতে থাকতেন সেই বাড়ির গৃহস্বামীর মেয়ের সঙ্গে ভালবাসা হল। মেয়েটির নাম মার্গারেট। খুব ভাল মেয়ে। তার খুব যত্ন করত। চাকরি করত কোন অফিসে। কিন্তু কোনদিন কোন বিষয়ে তার ত্রুটি হতে দিত না। ওখানেই বিয়ে হল। আসবার সময়ে তার সঙ্গেই এসেছিল। এখানে ছিল বছর কয়েক। একটি মেয়ে হল। মেয়েটি জন্মাবধি অসুখে ভুগতে লাগল। নিজে অনেক চিকিৎসা করল, কিছুই ফল হল না। মার্গারেট ঝোঁক ধরল বিলেত যাবে মেয়েকে নিয়ে। সেখানে সবচেয়ে ভাল শিশু-চিকিৎসককে দিয়ে দেখাবে। অচিন্ত্যদা তাদের বিলেত পাঠিয়ে দিয়ে একা থাকেন এখানে। ভাল লাগে না। কিন্তু উপায় কী?

বিশ্বনাথ এল একদিন। ব্রজলালের সম্বন্ধে মর্মান্তিক খবর দিল। ব্রজলাল কলিয়ারিতে একটি পাঞ্জাবি মেয়ের সঙ্গে ভাব করেছিল। তাকে নিয়ে পালিয়েছে। কাঠগোলার অনেক টাকাও সঙ্গে নিয়ে গেছে। ব্যবসার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ওর বাবার শরীরের অবস্থাও ভাল নয়। তিনিও ওটা বিক্রি করে দিতে বলেছেন। একজন খদ্দেরও পাওয়া গেছে।

বিশ্বনাথ তেওয়ারীকে ব্রজলালের কথা কিছুই জানাল না।

প্রয়োজনও ছিল না। অচিন্ত্যদা গোপনে তাকে বলেছিলেন, তার জীবনের মেয়াদ ছু মাসের বেশী নয়। তাই গোলাটা বিক্রি করে দেওয়াই স্থির করল।

তেওয়ারীকে গোলা বিক্রয়েব কথা জানাতেই হল। অচিন্ত্যদা অবশ্য কয়েক মাস আগে থেকেই ফী নিতেন · না। এমনই দেখে যেতেন। কিন্তু হোটেলেব খরচ ছিল। বোগীর জন্য অন্যান্য নানা খরচ ছিল, কাজেই টাকাব অত্যন্ত প্রয়োজন। তেওয়ারী বিক্রয়ে আপত্তি করলেন না। এ সম্বন্ধে যা' করবার বিশ্বনাথ করল।

যেদিন অচিন্ত্যদা তাকে তেওয়াবীর অনিবার্য আসন্ন মৃত্যুর খবর দিলেন সেদিন অন্তবেব মধ্যে সে সত্যিকাব আঘাত পেয়েছিল। পবম আত্মীয সম্বন্ধে এ ধবনের খবর পেলে মানুষ যে বকম আঘাত পায় তাব চেযে এক তিলও কম নয়। এতদিন একসঙ্গে থেকে তেওয়াবীকে নিজেব আত্মীয়ের মত সে ভালবেসেছিল।

একদিন অচিন্ত্যদাকে বলেছিল, যদি এ আশ্রয়টুকুও যায কী হবে আমাব অচিন্ত্যদা! আপনি আমাকে আশ্রয় দেবেন? অচিন্ত্যদা বললেন, আমি তো এখানে থাকব না ভাই। মার্গাবেট আর আমার মেযেবও ইচ্ছে আমি ওখানে চলে যাই। ওদেব ছেড়ে এখানে থাকতেও আমাব ভাল লাগছে না। ওখানে একটা চাকরির জন্যে মার্গারেট চেষ্টা কবছে। মনে হয় হয়ে যাবে। খবব পেলেই আমি চলে যাব।

তেওযাবীর মৃত্যু আসন্ন। বিশ্বনাথকে খবর দেওয়া হল সে এল। বিশ্বনাথ থাকতে থাকতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলল তেওয়ারী। বিশ্বনাথ সব ব্যবস্থা করল। ম্যানেজারবাবু খুব সাহায্য করলেন।

তেওয়ারীর মৃত্যুর পর অচিন্ত্যদা তাকে ছাড়লেন না। বললেন, যতদিন আমি এখানে আছি ততদিন থেকে যাও। বিশ্বনাথকে বললেন, আমি খবর দিলে এসে নিয়ে যাবে। সে হোটেলে থেকে গেল। হোটেলের খরচ অচিন্ত্যদা দিতে লাগলেন।

অচিন্ত্যদা দু-একদিন অন্তর খবর নিতেন। মাঝে মাঝে সাহেব-পাড়ায় যে বাড়িতে থাকতেন, সেখানে নিয়ে যেতেন। একদিন সেখানে ধীরেনদার সঙ্গে দেখা হল। ধীরেনদা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়েছিল।

ধীরেনদার একজন খুব বড়লোকের একমাত্র মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। স্ত্রীকে ধীরেনদা খুব ভালবাসত। বিয়ের তিন-চার বছর পরে ওর একটি ছেলে হল। ছেলেটির যখন বছর দুই বয়স, অসুখে ভুগে মারা গেল। ওরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই পুত্রশোকে ভেঙে পড়ল। তারপর ওর স্ত্রীর অসুখ হল। বুকের রোগ। অচিন্ত্যদার হাতেই চিকিৎসার ভার দিল ধীরেনদা। অচিন্ত্যদা প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু বাঁচাতে পারলেন না। পর পর দুটো তীব্র আঘাতে ধীরেনদা সংসার-জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল। শ্বশুরের সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে ওই টাকা দিয়ে ওর স্ত্রীর নামে গ্রামে একটি হাসপাতাল স্থাপন করল। নিজে সন্ন্যাস নিয়ে আশ্রমে বাস করতে লাগল।

ধীরেনদা অচিন্ত্যদাকে বলেছিল, দাদার অন্যায়ের প্রতিকার করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। আমার হাতে টাকা থাকলে, রাধার যাবজ্জীবন আশ্রয় ও গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে দিত। এখন তা সম্ভব নয়। তবে রাধা যদি হাসপাতালে নার্সের কাজ করতে চায় তো এখনই তাকে নিয়ে গিয়ে ব্যবস্থা করে দেব।

ধীরেনদার সঙ্গে একদিন গিয়েছিল সে সেখানে। স্টেশন থেকে নেমে বাসে করে প্রায় পঞ্চাশ মাইল যেতে হল। মাঝারি গোছের গ্রাম। গ্রামের পাশেই জঙ্গল। জঙ্গলের কোলে বিস্তৃত খোলা মাঠ। সেইখানেই বিরাট দোতলা বাড়ি। সেইখানেই হাসপাতাল। সেখানে যাবার জন্য একটি পাকা রাস্তাও তৈরি করিয়ে দিয়েছিল ধীরেনদা। রাস্তার এক পাশে হাসপাতাল। অন্য পাশে ডাক্তার ও নার্সদের থাকবার জন্যে সারি সারি বাড়ি।

ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল ধীরেনদা। বলল, এর নাম

লিখে রেখে দিন। নতুন এসে হয়তো কাজ ভাল পারবে না। ওকে কাজ শেখাবার ব্যবস্থা করবেন। আপনার ওপরে ওর সম্পূর্ণ ভার দিয়ে যাচ্ছি। দেখবেন যেন কষ্ট বা অসুবিধা না হয়।

ডাক্তারবাবু সসম্মানে সম্মতি দিলেন। তাকে বললেন, আপনি আসার আগে একটা চিঠি দেবেন। স্টেশনে লোক রাখবার ব্যবস্থা করব।

ওখান থেকে ফিরে আসবার কিছুদিন পরেই অচিন্ত্যদা বললেন, মার্গাবেটের চিঠি এসেছে। চাকরি স্থির হয়ে গেছে। শীগগির চলে যাচ্ছি। তোমার জন্যে আমার একটা চিন্তা থাকবে বরাবর। যদি ধীরেনের ব্যবস্থায় রাজী হও, তার কাছ থেকেই খবর পাব। আর যদি না রাজী হও তা হলে কী করে যে খবর পাব জানি না!

সে বলেছিল, যদি অন্য কোন উপায় না হয় তো ওইখানেই যাব।

অচিন্ত্যদা বললেন, অন্য উপায় কী হতে পারে?

সে বলল, বিশ্বনাথ যদি কোন উপায় করে দিতে পারে। ও আমাকে খুব ভালবাসে। আমার জন্য যথাসাধ্য ও করবে।

অচিন্ত্যদা বললেন, ছেলেটি সত্যি ভাল। আমার ছাত্র ছিল একসময়। আমি তখন বর্ধমানে থাকতাম। তুমি এক কাজ কর, বিশ্বনাথকে আসতে লেখ। ওর সঙ্গে এ সম্বন্ধে কথা বলতে চাই।

বিশ্বনাথ খবর পেয়ে এল। অচিন্ত্যদার সঙ্গে দেখা করল। বিশ্বনাথের সঙ্গেই সে চলে এল এখানে। অচিন্ত্যদা আগের দিন এলেন। ও প্রণাম করল। অচিন্ত্যদা আশীর্বাদ করলেন, ভগবান যেন তোমায় দেখেন!

যাবার আগে অচিন্ত্যদার গাড়ি পর্যন্ত সে গিয়েছিল। গাড়ির জানালায় হাত দিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়েছিল। অচিন্ত্যদা বললেন, কিছু বলবে?

সে বলল, বোনকে একেবারে ভুলে থাকবেন না দাদা। আপনাদের খবর মাঝে মাঝে বিশ্বনাথকে জানাবেন। তা হলে আমি যেখানেই থাকি জানতে পারব।

॥ ৩ ॥

সন্ধ্যে হয়ে গেল। ধীরে আঁধার ঘনিয়ে এল। সামনের মাঠে অন্ধকার জমতে লাগল। দূরে দিগন্ত-রেখা হারিয়ে গেল দৃষ্টির সীমানা থেকে। সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। রান্নাঘরে ঠাকুর-চাকর কী করছে কে জানে! বড় একলা মনে হল। কেউ কাছে নেই, দূরে-কাছে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মনে হল, সে যেন মরে গেছে; নিঃসীম অন্ধকারে চলেছে তার আত্মা গন্তব্যহীন পথে। মৃত্যু! একদিন তো হবেই। খোকাকে যেদিন হারাল, সেদিন তো মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল। নির্মম হাতে তার বুক থেকে তার বুকের মানিকটিকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল জীবনটাকে নিঃস্ব করে দিয়ে। যদি খোকা আজ থাকত, তা হলে জীবনের চেহারা অন্যরকম হত। খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে শত দুঃখদুর্দশা সহ্য করতে পারত। খোকার মৃত্যুর পর সংসারের সঙ্গে, স্বামীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে গেল। মন শৃঙ্খলমুক্ত পাখির মত উড়ে পালিয়ে গেল কোন দিক্‌হারা শূন্যতায়।

মৃত্যুকে আবার দেখল সেদিন— করুণাময় রূপে। সমস্ত যন্ত্রণা শেষ করে দিল এক নিমেষে। যদি এই মুহূর্তে মৃত্যু তেমনই করুণাময় রূপে আসে তার কাছে! আজ এখনই এই পথহীন মরুভূমির মধ্যে যদি সাথীহীন আনন্দহীন যাত্রার এখানেই সমাপ্তি হয়!

মোটরের শব্দ শোনা গেল। বিশ্বনাথ আসছে বোধ হয়। তারা এখান থেকে যাবার পর বিশ্বনাথ কলিয়ারির চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীন ব্যবসা শুরু করে ছিল। বেশ রোজগার করছিল। কম দামে একটা গাড়ি কিনেছিল।

গাড়িটা থামল বাড়ির সামনে। বিশ্বনাথ কাছে এসে দাঁড়াল। সে বলল, তোমাকে মনে মনে খুঁজছিলাম ভাই। এত দেরি হল!

বিশ্বনাথ বলল, কদিন ছিলাম না। রোগীর ভিড় ছিল।

মদন ছুটে এসেছিল গাড়ির শব্দ শুনেই। একটা চেয়ার তাড়াতাড়ি বার করে দিয়ে বলল, ডাক্তারবাবুকে সেই কথাটা—

রাধা বলল, আচ্ছা বলব।

বিশ্বনাথ চেয়ারে বসে বলল, কী কথা ?

রাধা বলল, ওর মায়ের কাপড় ছিঁড়ে গেছে, কাপড় কিনে দিতে হবে।

বিশ্বনাথ বলল, আচ্ছা দেব।

দুজনে চুপচাপ বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপব বিশ্বনাথ বলল, কী ভাবছেন ?

রাধা বলল, আমার কি ভাবনার শেষ আছে, ভাই! বিদেশ হোক, বিভুঁই হোক, পরের বাড়িতে চাকরানীর কাজ হোক, তবু তোমাদের মত আপনার জন কাছে পেয়েছিলাম। এর পর যেখানে যাচ্ছি সেখানেও তো চাকরানীব কাজ। যতদিন কাজ করতে পারব, ততদিন থাকতে দেবে, খেতে-পরতে দেবে। বয়স হচ্ছে, অসুখ-বিসুখও হতে পারে। যদি কাজ করতে আর না পারি তা হলে তাড়িযে দেবে। কোথায় যাব, কী করব! আত্মীযস্বজনহীন বিদেশে কে দুর্দিনে আশ্রয় দেবে, কে দু মুঠো খেতে দেবে, কে আমাকে দেখবে!

বিশ্বনাথ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমিও ভাবছি। একটা উপায়ও মনে হয়েছে। চেষ্টা করব কাল থেকে। আপনি নিজেকে যতটা নিঃসহায় নিঃসম্বল ভাবছেন, ততটা নন। ডাক্তার দাস কী বললেন সেদিন, মনে নেই ? ভগবান আপনাকে দেখবেন—তাঁর উপরেই নির্ভর করুন। তাঁকেই ডাকুন।

দুজনেই চুপ করে রইল। একটু পরে রাধা বলল, যে ভিখিরীটি স্টেশনে ভিক্ষে করছিল তাকে চেন ?

বিশ্বনাথ বলল, চিনি।

মদন যা খবর এনেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি কবল বিশ্বনাথ: সামনের গ্রামের জমিদারবাবু ওকে আশ্রয দিযেছিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিষ্কৃতি পেযেছিল বেচারা। জমিদাববাবু মাস কয়েক হল মারা গেছেন। আবাব দুর্গতি শুরু হয়েছে লোকটার। আশ্রয় একটা পেয়েছে। কিন্তু ভিক্ষাবৃত্তি তাব ঘোচে নি। আমাদেব গাঁযে ভিক্ষে করতে যায় মাঝে মাঝে। আমার মা ওদেব গান শুনতে ভালবাসেন। গেলেই খাওয়ান।

রাধা বলল, চেনা-চেনা লোক মনে হল। একদিন ওর কাছে যাব ভাবছি।

বিশ্বনাথ বলল, বেশ তো, কাল সন্ধ্যেয় যাওয়া যাবে।

॥ ৪ ॥

পবদিন সন্ধ্যাব কিছু আগে বিশ্বনাথ এল। বাধা বাবান্দায বসেছিল ওব মোটবেব শব্দ শোনাব জন্য উৎকর্ণ হযে। ওব গাডি থামতেই উঠে দাঁডল। বিশ্বনাথ এসেই বলল, আপনি তো একেবাবে তৈবি হযেই আছেন। চলুন।

দাঁড়াও, মদনকে ডাকি।

বিশ্বনাথ বলল, মদন কী কববে?

বাধা বলল, মদনও সঙ্গে যাবে। তুমি আমাদেব নামিযে দিযে বাড়ি চলে যাবে। মদন আমাকে ওখানে পৌঁছে দিযে ওব মাযেব সঙ্গে দেখা কবতে যাবে। ও ফিবে এলে আমি ওব সঙ্গে বাডি ফিবব।

বিশ্বনাথ বলল, বেশ, তাই হবে। ডাকুন ওকে।

ওদেব দুজনকে গ্রামেব পাশে নামিযে দিযে বিশ্বনাথ চলে গেল। মদনেব পিছু পিছু বাধা গ্রামেব দিকে চলল। বাধা বলল, তোব ভয কবছে নাকি বে?

মদন বলল, আজ্ঞে না, ভয কিসেব?

বাডিটাতে পৌঁছল দুজনে। বাধা মদনকে বলল, তুই তোব মাযেব সঙ্গে দেখা কবে আয, ফিবে এসে আমাকে ডাকবি, বুঝলি?

মদন চলে গেল। বাধা বাডিটায ঢুকল। দোতলা বাডি। একেবাবে ভেঙে বাসেব অযোগ্য হযে গেছে। বড বড গাছ গজিযেছে এখানে-সেখানে। দেওয়াল ছাদ চৌচিব কবে দিয়েছে। দবজা-জানালা একটিও নেই। সিঁড়িটা পড়ে গেছে। বাবান্দায ঘাস গজিয়েছে। সাবা উঠোনে আগাছাব জঙ্গল। এক পাশে বান্নাঘব। তারও ছাদ ফেটে গেছে। তাবই বারান্দাটা পরিষ্কাব করে এক পাশে বান্নার

ব্যবস্থা। আর এক পাশে একটা ময়লা চাটাই পাতা—ওখানেই শোয়ার ব্যবস্থা।

*   *   *

গৌরদাস রাঁধছে। চোখ দুটোতে ভাল দেখতে পায় না। অতি সাবধানে রান্না করতে হয়। একটা কেরোসিনের লম্ফ জ্বলছে এক পাশে। ভাত রান্না হচ্ছে। কয়েকটা আলু বেগুন যা জুটেছে, ফেলে দিয়েছে তাতে। তাই দিয়ে বাপ-ছেলে কোনরকমে খাবে ভাতগুলো। নির্ভেজাল ক্ষুন্নিবৃত্তি। একপাশে চাটাইটাব উপরে ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। ছেলেটাকে সবাই ভালবাসে। পাড়াব লোকেরা ওকে ডেকে খাওয়ায় মাঝে মাঝে, ওর গান শোনে। বেশ গান গায় ছেলেটা।

এই সময়টায় প্রতিদিন গৌবদাস তার অতীত জীবনেব কথা ভাবে। সাবাদিন ভিক্ষে কবে বেড়ায—কোনদিন স্টেশনে, কোনদিন বাজারে, কোনদিন গ্রামে, কোনদিন বা পাশেব গ্রামে। সন্ধ্যায় যখন এই ভাঙা বাড়িতে ফিবে আসে, ক্লান্তিব ভাবে দেহ এলিয়ে পড়তে চায়, যখন বসে বসে রান্না করে তখন তাব নিজেব ঘবের কথা মনে পড়ে—যে ঘবটিকে ঘিরে কত সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনাব স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেই ঘরটির কথা মনে হলেই সেই স্মৃতিকণাগুলি তাব মনকে কালো মেঘের মত ছেয়ে ফেলে।

রাধার কথা মনে পড়ে। কত কষ্টে পেযেছিল তার কাছে। ভাল করে খেতে-পবতে পায নি। চন্দ্রার কত গয়না ছিল, রাধার কিছুই ছিল না। না থাকুক, কিন্তু বাজ-বাজেশ্বরীব মত রূপ ছিল। ভগবান তার দেহে রূপ দিতে কার্পণ্য করেন নি, কিন্তু অদৃষ্টে সুখ দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। না হলে যাকে রাজাব ঘরে মানাত তাকে তার মত গরিবের ঘরে পড়তে হল কেন? কিন্তু সে নিজেকে মানিয়ে নিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। তার কথাবার্তায়, ব্যবহারে তার অন্তরের দ্বন্দ্ব বিন্দুমাত্র প্রকাশ পেত না। তবে, রাত্রে এক শয্যায় পাশাপাশি শুয়েও সে যে দূরবর্তিনী, নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়েও সে যে অনায়ত্তা, তার অন্তরাত্মা তা বুঝতে পারত।

তবু সে যে তাকে কাছে পেয়েছে, প্রতিদিনের জীবন-যাত্রায় তাকে পাশে পেয়েছে, তাতেই সে কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। আশা করত একদিন ব্যবধান কমে আসবে, স্বর্গ-কন্যা তাব অন্তবের মর্ত্যধামে সুপ্রতিষ্ঠিতা হবে।

মনে পড়ল একদিনের কথা। বাধা স্নান কবে ফিবছিল পুকুব থেকে। ভিজে কাপড সবাঙ্গে জডিযে আছে। শ্বেতপদ্মেব মত গাযের রঙ ভিজে কাপড চুঁইযে গডিযে পডছে, আনিতম্ব দীর্ঘ কালো চুল পিঠে লুটোচ্ছে। সে উঠোনে দাঁডিযে ছিল, দেখে বলে উঠল, চলে নীল শাডি, নিঙাডি নিঙাডি, পবাণ সহিত মোব।—বাধা ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তি-স্বরে বলল, ও সব আবাব কী। ভাল লাগে না। শহবে মানুষ হযেছিল। এসব বসিকতা পছন্দ কবত না। ওব বাবা ছিলেন স্কুলেব মাস্টাব। লেখাপডা শিখেছিল, খুব বেশী না হলেও পাডার্গাযেব মেয়েদের চেযে অনেক বেশী। রুচি ছিল অন্য বকম। কত বড বড লোকেব ছেলেদেব সঙ্গে পবিচয ছিল, হযতো সম্প্রীতিও ছিল। হযতো সুন্দব জীবনেব স্বপ্নও দেখত। তাব সঙ্গে বিযে হওযা সে হয়তো পছন্দ কবে নি। পাডার্গেঁযে অশিক্ষিত স্বামীব স্ত্রী হযে, অভাব-অনটনেব মধ্যে চাষা-ভুষো প্রতিবেশীদেব সঙ্গে বাস কবা সে হযতো অন্তবেব সঙ্গে গ্রহণ কবতে পাবে নি। হযতো নীবব ধৈর্যেব সঙ্গে সে এই অবাঞ্ছিত অসুন্দর জীবন থেকে মুক্তিব জন্য অপেক্ষা কবত দিনেব পব দিন।

খোকাব জন্মেব পব সে বদলে গেল একেবাবে। যে নাগালেব বাইবে ছিল, সে নিজে থেকে সমস্ত ব্যবধান অতিক্রম কবে ধবা দিল। জীবনেব রূপ গেল বদলে। যা কিছু তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকব ছিল, সব মূল্যবান হযে উঠল। প্রতিদিনেব বসহীন জীবন ওব স্পর্শে সবস হযে উঠল। খোকা যেন তাদেব দুজনেব জীবন একত্র কবে গেঁথে দিল। খোকাকে ঘিরেই ওদেব দুটি জীবন পবস্পবকে জডিযে ধবল

সূর্যের দিকে চেয়ে ফুটে থাকে কমল। তাকে ঘিরে গুঞ্জন করে ভ্রমর, তার মধু পান করে। তেমনই খোকার দিকে তাকিয়ে রাধা বিকশিত হয়ে উঠল, মধুময়ী হয়ে উঠল; সেই মধু পান করে তারও জীবন মধুময় হয়ে উঠল।

ঘনিয়ে এল দুর্দিনের কালো মেঘ। জীবনের আলো ম্লান হয়ে এল। যে ভালবাসা সতেজ ও সবুজ হয়ে উঠেছিল, তা দিনদিন নিস্তেজ বিবর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। এল প্রচণ্ড বন্যা। জমির উপর ফেলে দিয়ে গেল বালির স্তব। ধান হল না। দু বেলা দু মুঠো অন্ন দুর্লভ হযে উঠল। লজ্জা নিবাবণ অসাধ্য হয়ে উঠল। রাধা ছিন্ন-মলিন শাড়ি পরে রান্নাঘবের কোণে মুখ লুকিয়ে থাকতে লাগল। খোকার দুধ জোটানো দায় হল। চারিদিকে তাকিয়ে এ দুর্দিনে সামলাবার কোথাও কোন উপায় দেখতে পেল না তাবা।

উপায় ছিল—চাকরি করা। যারা কখনও করে নি তারা শুরু করে দিযেছিল। কিন্তু তার উপায় ছিল না। রাধা-মাধবেব সেবার ভার ছিল তার ওপর। তা ফেলে যাবার তার সাধ্য ছিল না। রাধা মুখে বিশেষ কিছু বলত না, কিন্তু ওব চোখ দুটি সর্বদা অনুযোগে মুখর হয়ে থাকত। ওর দৃষ্টি এড়াবাব জন্যে বাইরে বাইরে থাকত সারাদিন।

চন্দ্রার কথাও মনের মধ্যে জেগে ওঠে। তার মনেব মাঝে বাসা বেঁধে আছে চন্দ্রা। সব সময়ে মনের মাঝে ঘোরাফেরা করে। কখনও বা কিছুক্ষণের জন্য মনেব কোণে ঘুমিয়ে পড়ে, আবার জেগে ওঠে। চন্দ্রাকে কি সে কখনও ভুলতে পারে! যে চন্দ্রা চিরদিন স্নেহ করেছে, শ্রদ্ধা করেছে, তার কল্যাণ কামনা করেছে, সুখে-দুঃখে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—তার স্মৃতির সঙ্গে যে তার সমস্ত সত্তা সংপৃক্ত হয়ে রয়েছে। তাদের বৈষ্ণব-সমাজের শিরোমণি প্রেমদাস বাবাজীর পৌত্রী চন্দ্রা। বাবাজী মশায় তার বাবার পরম বন্ধু ছিলেন। ছেলেবেলা থেকে সে ওদের বাড়িতে ছিল। ওঁদের গ্রামে ছোট স্কুল ছিল একটি। সেখানে পড়ত। তারপর পড়ত ওখানকার টোলে।

প্রেমদাস বাবাজীর কাছে বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ করত। কীর্তন শিখত। তিনি খুব স্নেহ করতেন তাকে। তখন থেকে চন্দ্রার সঙ্গে পরিচয়। সেই থেকে চন্দ্রা তাকে স্নেহ করত, শ্রদ্ধা করত, সেবা করত। একসঙ্গে কীর্তন শিখেছিল বাবাজী মশায়ের কাছে। একসঙ্গে কীর্তন করত দুজনে। বাবাজী মশায় তাদের একসঙ্গে কীর্তন শুনতে ভালবাসতেন।

চন্দ্রার বিয়ে হল তার মায়ের এক বান্ধবীব ছেলের সঙ্গে। পরস্পরকে কথা দিয়েছিলেন তাঁরা। না হলে বাবাজী মশাযের ইচ্ছে ছিল তার সঙ্গে বিযে দেবার। চন্দ্রারও তাই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তার মা কিছুতেই রাজী হলেন না। চন্দ্রার স্বামী রতনও ছেলেবেলায় কাঁচামাটিতে ওর পিসীমার বাড়িতে থাকত। স্কুলে কিছুদিন পড়াশুনা করেছিল। বাজারে এক চালের আড়তে কাজ কবত বতন। ওখানেই পরিচয় হয়েছিল তার। যুদ্ধ বাধলে বতন একজন কন্ট্রাক্টারের অধীনে সরকারের কাজ কবে বেশ বোজগাব করতে লাগল। পোশাক-পরিচ্ছদ, কথাবার্তা, হাব-ভাব বদলে গেল বতনেব।

বাবাজী মশায় মারা গেলেন। চন্দ্রাব মা মাবা গেলেন। বতনকে থাকতে হত কর্মস্থানে। চন্দ্রা একা পড়ে গেল কাঁচামাটিতে। বতন তার এক পিসতুতো বোনকে এনে বাখল চন্দ্রাব কাছে। এই সময়ে চন্দ্রা প্রায়ই তাদের কাছে চলে আসত। খোকাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। খোকার যাতে অযত্ন না হয়, কোন ত্রুটি না হয়, সর্বদা লক্ষ্য বাখত। খোকার দুধের খবচ গোপনে বাধার হাতে জোর কবে গুঁজে দিয়ে যেত, দামী পোশাক কিনে দিত। বতন জানত, কিন্তু কখনও আপত্তি কবত না।

তাদেব সংসাব যখন অচল হয়ে উঠল, ওবা স্বামী-স্ত্রী যথাসাধ্য চেষ্টা করল তাকে সচল বাখতে। বতন তার মনিবের কাছে দরবার কবে তাব জন্য চাকরি যোগাড় কবেছিল। সে যেতে পারে নি।

খোকার অসুখ হল। চন্দ্রা ও বতন টাকা খবচ কবে চিকিৎসা করাল। কিছুতেই কিছু হল না। খোকা চলে গেল। তাব সঙ্গে চলে গেল জীবনের সুখ-শান্তি।

খোকা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাধা আবার সরে গেল তার কাছ থেকে। এবং যত দিন যেতে লাগল তাদের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল।

গ্রামের জমিদার তখন গ্রামে বাস করছিলেন। কলকাতায় বোমা পড়েছিল। সেখানে বাস করা নিরাপদ ছিল না। একদিন পাড়ার মাতব্বর অদ্বৈতদাস বাবাজীকে নিয়ে জমিদারবাবুর কাছে দরবার করল। তিনি রাধা-মাধবের ভার নিলেন। তারও ভার নিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় তাঁদের স্বামী-স্ত্রী দুজনকে কীর্তন শোনাল। তার কীর্তন তাঁদের খুব ভাল লেগেছিল। জমিদারবাবু তাকে চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

রাধা চন্দ্রাদের ওখানে যাওয়ার পর থেকে আর খবর নেয় নি। তার মনে হল, সবাই তাকে ত্যাগ করল। রাধা-মাধব. ত্যাগ করলেন। খোকা চলে গেল কাছ থেকে। রাধাও চলে গেল।

কলকাতা যাবার দিন স্থির হল। রাধাকে খবর দিতে গেল। রাধা, চন্দ্রা বা রতন কারও সঙ্গে দেখা হল না। ওরা রতনের মনিবের সঙ্গে কলকাতা বেড়াতে গিয়েছিল।

কলকাতা গেল জমিদারবাবুর সঙ্গে। প্রকাণ্ড বাড়ি। নানা কারবার আছে কলকাতায়। নিচতলায় অফিস। একটি অফিসে খাতা লেখার কাজ হল তার। জমিদারবাবুর বাড়িতেই খেতে লাগল।

তাদের অফিসে তারই পাশে বসে খাতা লিখত যে লোকটি তার সঙ্গে আলাপ হল। নাম বৃন্দাবন। পুরনো লোক। স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে কাছেই একটা গলিতে বাস করত। একদিন নিয়ে গেল তার বাড়ি। ছোট একটি ঘর। টালি দিয়ে ছাওয়া। সঙ্গে এক টুকরো উঠোন। পরিবারের সকলে মিলে খুব আপ্যায়ন করল তাকে। কীর্তন শুনতে চাইল। পাশাপাশি বাড়ি থেকে মেয়ে-পুরুষ ভিড় করে কীর্তন শুনতে এল। সকলেই তাকে একটা বাড়ি যোগাড় করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। নিঃশ্বাস ফেলল সে। রাধা-মাধব আহার ও আশ্রয়

হুয়েরই ব্যবস্থা করলেন।

জীবনের পথ যেন ঘন অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছিল এতদিন। হঠাৎ এক ঝলক আলো এসে সেই পথকে দৃষ্টিগোচর করল। সেই পথ ধরে মন চলে গেল দূর ভবিষ্যতের মধ্যে।

রাধাকে এনে আবার সংসার পাতবে ওই ছোট ঘরটিতে—সুখে-দুঃখে জীবন আবার চলতে থাকবে। খোকার মৃত্যুতে যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল তার ও রাধার মধ্যে ক্রমে তা মিলিয়ে যাবে। আবার ছেলে-মেয়ে আসবে রাধার কোলে। খোকাকে হারানোর বেদনা ক্রমে ফিকে হয়ে আসবে। আবার সে নিজেকে তার সংসারের মধ্যে নিঃশেষে বিলিয়ে দেবে।

রাধাকে চিঠি লিখল—আশ্রয় পেয়েছি। ভাল নয়। তবু এই বিপদের দিনে পথে পথে ঘোরাব চেয়ে, পরের আশ্রয়ে থাকার চেয়ে ভাল। যেখানে কাজ করি, তার কাছেই বাড়িটা। প্রতিবেশীরা সকলেই সাগ্রহে আহ্বান জানাচ্ছে। বিপদের কালো মেঘ কেটে যাবে একদিন। এই অন্ধকারে যদি আমরা পবস্পরের হাত ধরে থাকি, তা হলে যখন আকাশ পরিষ্কার হবে, আবার আলো দেখা দেবে, তখন আবার পথ চিনে নিয়ে নিজেদের পথে চলতে পারব। দু-চার দিন পরে তোমাকে নিযে আসব।

গোছগাছ কবতে একটু সময় লাগল। জমিদারবাবু খুব সাহায্য করলেন। গিন্নীও খুব সাহস দিলেন। একদিন রাধাকে আনবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। বলরামপুর স্টেশনে নামল। কাঁচামাটি পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। রাস্তায় যেতে যেতে কতরকম ভাবছিল। রাধা হয়তো সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। তার আত্মসম্মান অত্যন্ত বেশী। কারও বাড়িতে থাকতে চায় না। আবার নিজের সংসার হবে ভেবে তাব খুবই আনন্দ হয়েছে। কালই হয়তো সে যেতে চাইবে। চন্দ্রা ছাড়তে চাইবে না কিছুতেই। চন্দ্রা বড় ভাল মেয়ে। রাধাকে খুব ভালবাসে। তাকে স্নেহ করে, শ্রদ্ধা করে। রতন তাকে দেখতে পারে না। রঙ কালো, দেখতে ভাল নয়, এই তার অপরাধ। কিন্তু

তার মত শান্ত মধুর-স্বভাব কটা মেয়ের আছে। রতন বরাবর বাইরেটা দেখেই ভোলে। ভিতর পর্যন্ত চালাবার মত দৃষ্টির সূক্ষ্মতা তার নেই। অর্থের পিপাসা অত্যন্ত তীব্র। টাকার জন্যে ও সব করতে পারে।

বাড়িতে পৌঁছল। বাইরেব দরজা খোলা ছিল। উঠোনে গিয়ে দেখল ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালা হয নি তখনও। বাড়িটা খালি মনে হল। বাড়িতে কেউ নেই নাকি। সাড়া পেল না। রতনের নাম কবে ডাকল।

অন্ধকাবে ছাযামূর্তিব মত কে আসছে মনে হল। কাছে আসতে চিনতে পাবল, চন্দ্রা। তাকে দেখেই সভযে চন্দ্রা বলে উঠল, তুমি হঠাৎ এলে যে।

সে বলল, হঠাৎ আবাব কি। চিঠি পাও নি তোমবা ?, তোমার দিদি কোথায ? বতন ?

চন্দ্রা বলল, ওবা তো কলকাতা গেছে। তোমাব সঙ্গে দেখা হয় নি ?

সে জিজ্ঞাসা কবল, কবে গেছে ?

চন্দ্রা বলল, তোমাব চিঠি আসবাব তিন-চাব দিন পরে। বাবু কলকাতা গেলেন, তার সঙ্গে ও আব দিদি গেল।

সভযে সে বলে উঠল, সে কি! বলেই মাটিতে বসে পড়ল।

চন্দ্রা শঙ্কিতকণ্ঠে বলে উঠল, ওবা কলকাতা যায নি তা হলে ?

সে ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

চন্দ্রা কিছুক্ষণ চুপ কবে তাকিযে থেকে বলল, আমি বুঝেছি, কী হযেছে।

চন্দ্রা তাকে ঘবে নিয়ে গিযে বসাল। আলো জ্বেলে নিযে এসে তাব কাছে বসল। তারপর ধীরে ধীবে সব ঘটনা বলল। রতনের মনিব প্রায়ই তাদের বাড়িতে আসত। বাধার সঙ্গে শহরে থাকতে পবিচয় ছিল। তাকে দাদা বলে ডাকত বাধা। রাধাকে নাকি খুব স্নেহ কবত। তাদের মাঝে মাঝে সিনেমা দেখাত। কলকাতায নিয়ে গিযেছিল। কলকাতায রাধাকে নিযে তার কাকাব বাড়িতে যেত। তাঁরাও

নাকি রাধাকে আগে থেকে চিনতেন। এখানের কাজ বাবুর শেষ হয়েছিল। পশ্চিমে যাবার কথা ছিল। হঠাৎ বলল, ওর কাকার অসুখ, কলকাতায় কাজ করবে। রতনকে সঙ্গে নিয়ে গেল। রাধাকেও পৌঁছে দেবে বলে সঙ্গে নিয়ে গেল।

দুজনে চুপচাপ বসে রইল। রতনের দিদি কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। বলল, রাধা নেই। রতনকেও ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। আর ওরা ফিরবে না। ওদের আশা ছেড়ে দাও তোমরা। আমি বার বার বলেছিলাম রতনকে, বড়লোকদের সঙ্গে অত মেলামেশা ভাল নয়। ওরা হল বাঘ-ভালুকের জাত। রাধাকে বলেছিলাম, কে কবেকার দাদা! অত ঢলাঢলি করা কেন? কে কার কথা শোনে!

রাধা যে তার কাছ থেকে হারিয়ে গেল বুঝতে দেরি হল না তার।

তার মনে হতে লাগল, রাধা কী করে এত ভুল করল! রতনকে তো সে চিনত! কেন তার প্ররোচনায় ভুলল? অন্ন-বস্ত্র, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সকলেই চায়। কিন্তু যদি না জোটে, তবে কি নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে তা জোটাতে হবে! রতনের মনিবকে হয়তো সে কোনদিন ভালবেসেছিল, কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদা, নিষ্কলুষ নারীত্বের মর্যাদা সে ভুলল কী করে? সে লেখাপড়া শিখেছিল—এই কি তার শিক্ষার পরিচয়? যে দেহে একদিন খোকার আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই দেহকে মাংসখণ্ডের মত ক্ষুধিত পশুর মুখে সে তুলে দিল!

সেদিন থেকে হারিয়ে গেল রাধা। হারিয়ে গেল যদিও সে বাইরের জগৎ থেকে, কিন্তু তার অন্তরের মধ্যে সেই সুন্দরী পবিত্রা রাধা তেমনই বিরাজ করছে।

চন্দ্রা একা থাকতে চাইল না। কার কাছে থাকবে। গাঁয়ে কী করে সে লোকের কাছে মুখ দেখাবে। বলল, আমাকে নিয়ে চল, না হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

চন্দ্রাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরল। তার নতুন সংসারের হাল ধরল চন্দ্রা। জীবন চলতে লাগল দম দেওয়া ঘড়ির মত। মন

অন্তরের এক কোণে বসে পূর্ব-স্মৃতির জপে মগ্ন হয়ে রইল।

প্রতিবেশীরা তাদের স্বামী-স্ত্রী ভাবত। তাদের সঙ্গে সেই ভাবেই ব্যবহার করত। কারও মনে লেশমাত্র সন্দেহ জাগত না। জমিদারবাবুর বাড়িতে নিয়ে যেত চন্দ্রাকে। জমিদারবাবুর পুত্রবধূরা তাকে খুব স্নেহ করতেন।

চন্দ্রা তার সেবা করত নিখুঁতভাবে। তাকে ভালবাসত চন্দ্রা ছেলেবেলা থেকেই। তার সেবায় আনন্দ পেত।

বৎসর খানেক কাটল। পূজোর সময় জমিদাববাবুদের দেশে যাওয়া স্থিব হল। তাঁরাও তাকে সঙ্গে যাবাব জন্যে বললেন। সে রাজী হল না। চন্দ্রা শুনে বলল, এখানে আর আমার ভাল লাগছে না। আমাকে পাঠিয়ে দাও।

সে বলল, সেখানে একা থাকতে পাববে?

চন্দ্রা বলল, খুব পাবব।

সে বলল, ওঁদেব কাছে, প্রতিবেশীদের কাছে আসল পবিচয় বেরিয়ে পড়বে যে!

চন্দ্রা বেপরোয়া হযে বলল, পড়াই তো ভাল। এ অভিনয় আমার আব ভাল লাগছে না।

সে জিজ্ঞাসা করল, কী চাও তুমি?

মুখ গম্ভীব করে দাঁড়িয়ে রইল সে। জবাব দিল না।

চন্দ্রা যাবার জন্য তৈরী হতে লাগল। কিছু বললেই ঝাঁজিয়ে বলে উঠত, তোমার এত ভয় কিসের? কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলো বাপের বাড়ি গেছি। তা হলেই কেউ কিছু বলবে না। একদিন বলল, এতদিন বিনা পযসায় রাঁধুনিব কাজ করলাম। একটি উপকার করতে পারবে?

সে বলল, কী?

আমাকে বলরামপুর স্টেশনে নামিযে দিয়েই চলে এস। সঙ্গে করে বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে না।

আবাব ফিরবে কবে?

আর ফিরব না।

একা থাকবে? চলবে কী করে?

কী দরকার চলবার, কী দরকার বাঁচবার! যার মুখের দিকে তাকাবার কেউ নেই, কী হবে তার বেঁচে। আমি মরব। আর আমি পারছি না বাঁচতে। বলে হঠাৎ হু হু করে কেঁদে ফেলল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে দু হাতে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল—যেন বহু দিনের রুদ্ধ প্রবাহ হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

পাশে বসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে গেল সে। চন্দ্রা ঝাঁজিয়ে বলল, ছুঁয়ো না আমাকে। পরস্ত্রী আমি। বলে হাতটা সরিয়ে দিল।

সে চুপ করে হতভাগিনীর কান্নার আবেগে কম্পমান দেহটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

তার বুকের ভিতরটা কেমন করতে লাগল। মনে হল, এক বছর দুজনে একান্ত পাশাপাশি বাস করেছে। তাদের দুটি অন্তর পরস্পরকে বহু তন্তু দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। চন্দ্রা একটু সরে যেতেই অন্তরে টান পড়ল। চন্দ্রাকে ছেড়ে থাকা সম্ভব নয় বুঝতে পারল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। চন্দ্রা তেমনই বসে রইল। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল সে। চন্দ্রা মুখ তুলে বলল, কোথা যাচ্ছ?

সে বলল, রান্না করিগে।

চন্দ্রা ধড়মড়িয়ে উঠে বলল, থাক্, খুব হয়েছে। আমি গেলে যা করতে হয় করবে। বলে উঠে চলে গেল।

রাত্রে চন্দ্রা শুতে এল না। বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। সে জিজ্ঞাসা করল, শোবে না?

বলল, বাইরে শোব।

সে বলল, আমি বাইরে শোব। তুমি ভিতরে শোও।

চন্দ্রার মুখের চেহারা বদলে গেল এক মুহূর্তে। চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি মরে গেলেই তো তোমার সুখ। তাই তো তুমি চাও।

হুজনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। সে ঘরে ঢোকবার উপক্রম করতেই চন্দ্রা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে। তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগল : আর আমি পারছি না, আমাকে নাও তুমি।

হঠাৎ তার মনে হল, যে নাগালের মধ্যে ধরা দেয় নি, দেবে না কোনদিন, তার জন্যে অপেক্ষা করে কী হবে। যে নিজে ধরা দিয়েছে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরাই ভাল।

বুকে জড়িয়ে ধরল চন্দ্রাকে। সপ্তমী পূজোর দিন মদনমোহনের মন্দিরে কণ্ঠি-বদল হল তুজনের।

কাটতে লাগল দিন। চন্দ্রার আনন্দের সীমা রইল না। নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দিল তাব কাছে। জীবনের চেহারা গেল ফিরে। আনন্দময়ী চন্দ্রা আনন্দের স্রোতে তার মনের সব গ্লানি ধুয়ে মুছে দিল।

এল খোকা। নাম দিল গোপাল। একরাশ মল্লিকা ফুলের মত ধবধবে ছেলে। চন্দ্রার কোল আলো করে থাকত। চন্দ্রা বলত, আমার কোলে মানাচ্ছে না, দিদির কোলে মানাত। কোথায় যে গেল হতভাগী! বলে মুখখানি ম্লান করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত। বলত, দিদির মনে মনে বড় লোভ ছিল। টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি, গাড়ি-বাড়ির লোভ। শহরে মানুষ হয়েছিল। বড়লোকদের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে মিশত। ওদের সুরে সুর বেঁধেছিল জীবনের। আমাদের মত গরিবের সংসারে এসে ওর সুর কেটে গেল। সুখ পেল না। সুখের লোভে ভুল করে ফেলল।

রতনের সম্বন্ধে বলত, পরের জিনিসে বরাবর লোভ ছিল ওর। স্কুলে যখন পড়ত, এর ওর জিনিস নিয়ে পালিয়ে আসত। ওর মা পিসীমা কত বোঝাতেন। কিন্তু স্বভাব কি যায়? বড় হল। আড়তে চাকরি করবার সময়ও তু-একবার চুরি করেছিল। ধরাও পড়েছিল। চাকরি যায় নি—দাতুর সঙ্গে আড়তদারের খাতির ছিল বলে। বোস সাহেবের চাকরি করবার সময়েও চুরি করত। বোস সাহেব জানত,

সুযোগ দিত। অনেক খারাপ কাজ করাত ওকে দিয়ে। টাকা পেলে ওর অসাধ্য কিছু ছিল না। দিদির প্রতি ওর লোভ ছিল। দিদি জানত না।

সে বলল, তুমি জানতে ?

চন্দ্রা বলল, জানব না। মেয়েমানুষের চোখে কিছু এড়ায় নাকি ? তুমি যে বাবুদের মেয়েদের কাছে বসে কীর্তন গাও, একদিন একটা বেয়াড়া চাউনি চাও দেখি, আমি ধরে ফেলব ঠিক।

হাসতে লাগল সে।

আবার সন্তান-সম্ভবা হল চন্দ্রা। শরীর খুব খারাপ হয়ে এল। পুত্র-সন্তান হল। কিন্তু বাঁচল না কেউ। প্রসূতি ও শিশু তুজনেই মারা গেল।

তার সহকর্মী·বৃন্দাবনের স্ত্রী খুব সেবা করল। বড় ভাল মেয়েটি। ঠিক নিজের বোনের মত ভালবাসত চন্দ্রাকে। শ্রদ্ধা করত তাকে। বৃন্দাবনও ঠিক দাদার মত স্নেহ করত তাকে। গোপালকে বৃন্দাবনের স্ত্রী মানুষ করতে লাগল। সে একা-একা কাটাতে লাগল।

জমিদারবাবু মারা গেলেন। ছেলেদের মধ্যে বনিবনা হল না। ব্যবসা ভাগাভাগি হল। সে বড় ছেলের অফিসে কাজ করতে লাগল।

বৃন্দাবন মারা গেল। বৃন্দাবনের স্ত্রী দেশে চলে গেল। খোকাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, সে রাজী হয় নি। বৃন্দাবনের স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নিল।

বৎসর কয়েক কেটে গেল। চোখে ছানি পড়তে লাগল তার। দৃষ্টি দিন দিন ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল। কাছের জিনিসও দেখা কষ্টকর হয়ে উঠল। কাজ করা অসম্ভব হয়ে উঠল। বাবু কাজ থেকে বিদায় করে দিলেন। খোকার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ল পথে।

তারপর পথে পথেই দিন কাটছে। হয়তো কখনও কখনও কোথাও তুদিনের জন্যে আশ্রয় জোটে, তারপর আবার সেই পথ। ছেলেটির

হাত ধরে চলে, ভিক্ষা করে। বয়স হয়েছে—শরীর আর বইতে চাচ্ছে না এই পথ চলার ক্লান্তি। জীবনীশক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে দিন দিন। মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। খোকা এই বিশাল পৃথিবীতে একা পড়ে থাকবে। কেউ দেখবার থাকবে না। কেউ হাত ধরে তাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবার থাকবে না। অনন্ত পৃথিবীর অনন্ত পথের অরণ্যে হারিয়ে যাবে সে।

বাড়িটার ভিতরে ঢুকল রাধা। উঠোন-ভরা আগাছার জঙ্গলের ভিতর একটা সরু পথ ধরে রান্নাঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ভাবল, এখানে এভাবে থাকে কী করে। ওর নিজের না হয় জীবনের মায়া নেই, কিন্তু ওই ছেলেটির উপরেও কি মায়া নেই। এমন সোনার চাঁদ ছেলে! কী রকম মানুষ যে। সব বিষয়ে উদাসীন। কোনদিন উচ্ছ্বসিত হল না—না আনন্দে, না দুঃখে, না মিলনে, না বিচ্ছেদে। ভালবাসে, কিন্তু আবেগ নেই। প্রকাশে বাহুল্য নেই। খোকার সম্বন্ধেও তো তাই ছিল। কোলে করত, আদর করত, কিন্তু যে স্নেহ সহস্র বাহু দিয়ে স্নেহপাত্রকে জড়িয়ে ধরেও তৃপ্তি পায় না, তা ওর ছিল না কোনদিন।

গৌরদাসের ভাত হয়ে গেছে। ভাত নামাতে হবে। ভাত নামাবার জন্যে গোপালকে ডাকতে লাগল।

রাধা বলে উঠল, গোপাল কি করবে?

চমকে উঠল গৌরদাস। বলে উঠল, কে?

রাধা বলল, আমি। কাল স্টেশনে যার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

গৌরদাস ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল, ও, আপনি এসেছেন। কিন্তু বসতে দেব কোথায়। ভিখিরীর দু দিনের সংসার। ওই চাটাইটাই সম্বল। ওখানেই বসুন।

রাধা বলল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না।

গোপালকে ডাকছিলে কেন?

গৌরদাস বলল, ভাতটা নামাবে। আমি চোখে ত ভাল দেখতে পাই না।

রাধা বলল, ওইটুকু ছেলে পারে ওসব করতে ?

গৌরদাস বলল, পারে। ডাকল, ও বাবা গোপাল, ওঠ্ বাবা। তারপর বলল, খিদেয় ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন তো খেতে পায় না। খিদে পায় খুব।

গোপাল উঠে বসে চোখ মুছতে লাগল, ঘুম-ঘুম চোখে রাধার দিকে তাকাল।

রাধার মনে হল, তার খোকা বেঁচে থাকলে এতদিনে এমনই হত। রাধা জিজ্ঞাসা করল, তোমার ছেলে ?

গৌরদাস বলল, হ্যাঁ মা।

রাধা বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবল, সে চলে আসবার পর গৌরদাস কি আবার বিয়ে করেছিল !

গোপালের আবার ঘুম এসে গিয়েছিল। ঢুলে ঢুলে মাথাটা নুয়ে পড়ল।

রাধা বলল, আমি যদি ভাতটা নামিয়ে দিই, আপত্তি হবে তোমার ?

গৌরদাস বলল, সে কী ! বড়লোকের স্ত্রী আপনি, বাড়িতে কত চাকর, ঠাকুর—আপনাদের কি এসব অভ্যাস আছে ? তা ছাড়া, একটা ভিখিরীর—

তোমার আপত্তি নেই তো ? বলে রাধা এক মুহূর্তে প্রস্তুত হল। একটা মাটির হাঁড়ি থেকে জল নিয়ে হাত ধুয়ে বলল, সরে দাড়াও একটু।

গৌরদাস গোপালকে ডেকে বলল, দেখ্ বাবা দেখ্, তোর জন্যে মা লক্ষ্মী কী করছেন।

রাধা বলল, আমাকে মা লক্ষ্মী বলো না। আমার নাম রাধা, ডাকতে হয়তো নাম ধরে ডেকো আমায়।

গৌরদাস বলল, রাধা আপনার নাম ? কেমন দেখতে জানি না। গলার স্বর কিন্তু ঠিক তার মত।

ভাতের ফ্যান গালতে গালতে রাধা বলল, রাধা বলে কাউকে চিনতে নাকি ?

গৌরদাস বলল, হ্যাঁ।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কবে এসেছ এখানে ?

গৌরদাস বলল, চার-পাঁচ মাস হবে।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় ছিলে আগে ?

গৌরদাস বলল, ঘাটেঘাটেই তো ভেসে বেড়াচ্ছি। এর আগে একটা স্টেশনের কাছে ভাঙা একটা ঘরে ছিলাম মাস খানেক। স্টেশনে ভিক্ষা করতাম। এ গাঁয়ের জমিদার কীর্তন শুনলেন। ভাল লাগল। নিয়ে এলেন সঙ্গে করে। আশ্রয় দিলেন তাঁরই কাচারি-বাড়ির একটি ঘরে। খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ছেলেটার ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আশা দিলেন। ভাবলাম, তীরে উঠলাম। কিন্তু পা দিতে না দিতেই ভাঙন শুরু হল। দু মাসের মধ্যে পর পর গিন্নী গেলেন, কর্তা গেলেন। ছেলেরা কাচারি-বাড়িতে থাকতে দিতে চাইল না, এখানেই চলে এলাম। এটাও ওদের সম্পত্তি। মাস দুই কাটাচ্ছি এখানে। তবে এটাও ছেড়ে দিতে হবে।

রাধা বলল, কেন ?

গৌরদাস বলল, পূর্ববঙ্গের এক ভদ্রলোক বাড়িটা কিনেছেন। আমরা না গেলে সারাতে পারছেন না।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে এর পর ?

গৌরদাস বলতে লাগল, পথের মানুষ, পথেই ফিরে যাব। দু দিনের আশ্রয় পেয়েছিলাম রাধা-মাধবের ইচ্ছায়। সে আশ্রয় ভাঙল তাঁরই ইচ্ছায়। আমাদের হাত কিছু নেই। একটু চুপ করে থেকে বলল, এমনই হয়েছে বরাবর। যে-গাছের নিচে দাঁড়িয়েছি, সে-গাছই ভেঙে পড়ে গেছে।

রাধা মনে মনে বলল, আমারও তো তাই। দুজনের একই ভাগ্যলিপি!

ফ্যান গালা শেষ হল। হাঁড়িটা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে রেখে রাধা বলল, আর কিছু কি হবে ?

গৌরদাস বলল, কী বলছেন মা ?

ধমকের সুরে রাধা বলল, আবার 'মা' বলছ ? বারণ করলাম না ?

গৌরদাস বলে উঠল, আশ্চর্য ! ঠিক যেন আমার রাধা কথা বলছে ! অবিকল অমনই গলার স্বর ! কতদিন শুনি নি !

রাধা জিজ্ঞাসা করল, রাধা কে ছিল তোমার ?

প্রথমা স্ত্রী।

দ্বিতীয়া হয়েছিল নাকি ?

হ্যাঁ।

কি নাম ছিল তার ?

চন্দ্রা।

প্রথমার কী হল ?

ছেড়ে চলে গেল। অদৃষ্টে আমার এত সুখ সইল না।

বাধা জিজ্ঞাসা করল, মাবা গেল ?

গৌরদাস ম্লানমুখে চুপ কবে রইল কিছুক্ষণ। তাবপব বলল, না।

রাধা বলল, আর কিছু কী হবে বললে না তো ?

গৌরদাস বলল, আর কিছুই হবাব নেই। গোটা-চাবেক আলু ছিল। হাঁড়িতে চালের সঙ্গে ফেলে দিযেছি। একবেলা খাওয়া !

দুটো শালপাতায় ভাতগুলো ঢালল বাধা। মোটা চালেব লাল লাল ভাত। আলুগুলো বাব কবে খোসা ছাড়িযে নুন তেল দিযে মাখল।

গৌরদাস বলল, অনেক কষ্ট করলেন আমাদেব জন্যে।

একটু দূরে রাধা দুটো শালপাতা পেতে গৌরদাস ও গোপালেব খাবার ব্যবস্থা করে দিল।

গৌরদাস বলল, পরে খাব।

রাধা বলল, খেতে দিযেছি, এখনই খেযে নাও। গোপালকে ডাক।

গৌরদাস বলল, আপনি বসে থাকবেন, আমরা খাব ?

রাধা বলল, তাতে দোষ নেই, ওঠ।

গোপালের কাছে গিয়ে গোপালকে ডাকল বাধা। গোপাল উঠল। চোখ মেলে রাধার দিকে তাকাল। চিনতে পারল। বলে উঠল,

আপনি! আপনি এখানে!

গৌরদাস বলল, ওঠ্। প্রণাম কর্। তোর পিসীমা। তুই তো উঠলি না। উনিই সব করলেন।

গোপাল উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করল রাধাকে। বাধা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

ওদের খেতে বসাল রাধা। সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। জিজ্ঞাসা করল, দিনের পর দিন কি এই খাও?

গৌরদাস বলল, এর বেশী কোথায় পাব? রাধা-মাধব এই যে জোটাচ্ছেন তাই ঢের। তবে গোপাল মাঝে মাঝে ভাল খেতে পায়—না রে গোপাল?

গোপাল গোগ্রাসে খাচ্ছিল। ভরামুখে ঘাড় নেড়ে বলল, হুঁ।

গৌরদাস বলতে লাগল, গেবস্ত-বাড়িব গিন্নী মেয়েবা ওকে খাওয়ায়। ওর কীর্তন শুনতে সকলে ভালবাসে।

বাধা বলল, কীতন গাইতে শিখেছে বুঝি?

গৌরদাস বলল, হ্যাঁ, শিখেছে কিছু কিছু।

বাধা বলল, লেখাপড়া শিখছে না?

গৌবদাস বলল, আমাব মত পণ্ডিতেব ছেলে কত পণ্ডিত হবে! বৈষ্ণবের ছেলে, ভিক্ষে করেই জীবন কাটাবে।

॥ ৫ ॥

পরের দিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরবার পথে বিশ্বনাথ নামল। রাধা বসেছিল বারান্দায়। বিশ্বনাথ এসে পাশের চেয়ারটায বসল। হাতে একটা মোড়ক ছিল। রাধার হাতে দিয়ে বলল, মদনের মায়ের কাপড়।

মদন বিশ্বনাথের মোটরের শব্দ শুনেই এসে অদূরে দাঁড়িযেছিল। তার নাম শুনেই এগিয়ে এল। বিশ্বনাথ বলল, এই যে মদন। তোর মার কাপড় এনেছি। নিয়ে যা।

মদন হাসিমুখে এগিযে এল। রাধা তার হাতে শাড়িটা দিয়ে বলল,

শুধু হাসলে হবে না। বাবুকে একটু চা খাওয়া।

বিশ্বনাথ বলল, কাল দেখা হল? আপনার চেনা লোক তো?

রাধা ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

বিশ্বনাথ বলল, ওকে জানলেন কী করে?

রাধা বলল, একই জায়গায় বাড়ি আমাদের। কাছাকাছি দুটো গ্রামে, একই নদীর ধারে। ছেলেবেলা থেকে চিনতাম। আমাদের গ্রামে যেত আসত। ওর স্ত্রীকেও চিনতাম। তারও নাম ছিল রাধা। আমার সঙ্গে ভাব ছিল খুব। সেবারে নদীতে এল প্রবল বন্যা নদীর দুই তীরের যত গ্রাম ভাসিয়ে দিল। কত সংসার ভেসে গেল। কত মানুষের সম্ভ্রম মনুষ্যত্ব ভেসে গেল। সেই বন্যায় গোবিদাসও ভেসেছিল, আমিও ভেসেছিলাম। দুজনে এখনও ভেসে চলেছি। মাঝে মাঝে তীরে এসে ঠেকছি। আবার স্রোতের টান দু দণ্ডের আশ্রয় থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কোন্ অতল সমুদ্রের বুকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথ বলল, লোকটি কিন্তু ওর এই জীবনকে সহজ ভাবেই নিয়েছে বলে মনে হয়।

রাধা বলল, নেবে বইকি। সাধুসন্ন্যেসী মানুষ। রাধা-মাধবের সেবাইত ছিল। তিনিই ছিলেন ওর জীবন দেবতা। তাঁর পায়েই সঁপে দিয়েছে নিজেকে। যা করবার তিনিই করবেন, ওর করবার কিছুই নেই। তখন প্রায়ই বলত, আমরা তাঁর হাতের পুতুল। এটা ওর মুখের কথা ছিল না। মনে-প্রাণে তা বিশ্বাস করত। তাই যে দুঃখই আসুক, যত দুর্গতির মধ্যেই পড়ুক, ওদের মত মানুষেরা হাসিমুখে সবকিছু সহ্য করতে পারে। ওরা অসাধারণ ব্যক্তি। সংসারের বাইরে ওদের স্থান। আমাদের মত সংসারের সাধারণ জীব যারা, তাদের ওদের মত লোক নিয়ে চলে না।

শেষ দিকটায় রাধার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভের বেশ বাজল। বিশ্বনাথ সবিস্ময়ে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে।

রাধা বলতে লাগল, আমাকেই দেখ না। ভেসে চলেছি—কূল

সমুদ্রে পড়ে৷ তলিয়ে যেতে দেরি নেই। তবু তীরে উঠে কোথাও কোন শক্ত মাটিতে আশ্রয় নিয়ে বাঁচবার চেষ্টা করছি। ওর কোন চেষ্টা নেই। রাধা-মাধব যা করবেন বলে স্রোতের মুখে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছে।

একটু চুপ করে থেকে রাধা বলল, ওই ছেলেটার কথা ভাব দেখি? কী হবে ওর? ওই ফুলের মত ছেলে—রাজার বাড়িতে যাকে মানায়—ওর হাতে পড়ে কী দুর্দশা হচ্ছে ওর!

বিশ্বনাথ বলল, ছেলেটি বেশ কীর্তন গাইতে শিখেছে এই বয়সেই।

সক্ষোভে বলল রাধা, কীর্তন গাইতে শিখেছে! তবে আর ভাবনা নেই। কীর্তন গাইতে শিখে নিজে রাজত্ব করছে, সেই রাজ-সিংহাসনে ছেলেকে বসিয়ে দিয়ে যাবে।

বিশ্বনাথ রাধার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল।

রাধা বলল, একটু চেষ্টা করলে তোমাদের মত কোন ভদ্রলোককে ধরে ছেলেটাকে মানুষ করবার ব্যবস্থা তো করতে পারে।

বিশ্বনাথ বলল, কে কার ব্যবস্থা করে দিদি! কারও কাছে গেলে—তিনি যতই ভদ্রলোক হোন—মুখে সহানুভূতি দেখাবেন, ঠেকাতে না পারলে দু চার আনা দান করবেন, কিন্তু গরিবের সত্যি উপকার কেউ করবেন না। গরিবদের জন্যে গলাবাজি করতে দেখেছি অনেককে, গরিবের দুঃখে কাঁদতেও দেখেছি দু-পাঁচজনকে, কিন্তু গরিবদের দুঃখ-দুর্দশা চিরদিনের জন্য দূর করে, মানুষের মত বাঁচবার ব্যবস্থা কেউ করে না।

বক্তৃতা দিল বিশ্বনাথ। সুযোগ পেলে দিয়েছেও দু-চারবার।

একটু চুপ করে রাধা বলল, ওর স্ত্রী আমার বন্ধু ছিল বলেছি তোমাকে। ভাল মানুষ ছিল, বুঝত না কিছু। তার বাবাও আমার বাবার মত শিক্ষক ছিলেন। অনেক ছেলে পড়তে যেত ওদের বাড়িতে। তাদেরই একজনকে ভালবেসেছিল। পায় নি তাকে। গৌরদাসের সঙ্গে বিয়ে হল। মনের মিল হয় নি সম্ভবত। বন্যায় গৌরদাসের ঘরবাড়ি ভেসে গেল। ভেসে গেল তার রাধা-মাধব। রাধা তার স্বামীর কাছ থেকে চলে এসে আশ্রয় নিল এক আত্মীয়ের বাড়িতে। সেখান থেকে তার পূর্ব-পরিচিত একটি ছেলে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেল।

তারপর তার কী হল গৌরদাস তা জানে না। হয়তো রাধাকে সেই ছেলেটি পথের মধ্যে ফেলে দিয়ে পালিয়েছে, হয়তো পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে মরে গেছে রাধা, হয়তো বেঁচে আছে জীবন্মৃতা হয়ে। যদি বেঁচে থাকে, এতদিনে হয়তো সংসারকে চিনেছে—চিনেছে সংসারের মানুষকে। সেই ভালমানুষী হয়তো আর নেই তার। বা দুঃখের তাপে দুর্ভাগ্যের পেষণে পাথর হয়ে গেছে সে।

মদন চা নিয়ে এল। একটু চুপ করে থেকে রাধা বলতে লাগল, কাল যখন গেলাম, গৌরদাস রাঁধছিল। ছেলেটি এক পাশে ঘুমুচ্ছিল। রান্না হল ভাত আর আলুসেদ্ধ। তাই সারাদিনের পর খেল দুজনে। জিজ্ঞাসা করতে বলল, এই-ই দিনের পর দিন খাচ্ছে। সারাদিনের পর ওই খাওয়া—এভাবে বাঁচবে কতদিন! ওর দিন না হয় শেষ হয়েছে, অনেক কষ্টও পেয়েছে জীবনে, হয়তো এখান থেকে চলে যাওয়াটাই মনে-প্রাণে চাইছে। কিন্তু ওই কচি ছেলেটা! জন্মের পর থেকে সে এক ফোঁটা আনন্দ পেল না, সুখ ও আরাম পেল না, স্নেহ ও আদর পেল না—সে কিছু না পেয়েই চলে যাবে পৃথিবী থেকে। আমি তার মায়ের বন্ধু আর মাতৃস্থানীয়া হয়েও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব, কিছু করব না! আমি তো ভাসছিই, কিন্তু আমার চোখের সামনে দিয়ে ওই কচি ছেলেটা যদি ভেসে যায়, তাকে আকড়ে ধরব না! যদি আমি বাঁচবার চেষ্টা করি, ওকেও কি বাঁচাবার চেষ্টা করব না!

বিশ্বনাথ বলল, কী করতে চান?

রাধা বলল, ওদের দুজনকে নিয়ে আবার ঘর বাঁধতে চাই। ওই ছেলেটির মায়ের স্থান আমি নিতে চাই। আমার হৃদয়ের সব স্নেহটুকু ওকে দিয়ে ওর মাতৃস্নেহের ক্ষুধা মেটাতে চাই। ওকে মানুষের মত মানুষ করে তুলতে চাই। কাল ওদের কাছ থেকে আসা অবধি সেই কথাটাই ভাবছি। এ না করলে আমি মরেও শান্তি পাব না। তুমি আমাকে দিদির মত দেখ, আমাকে স্নেহ কর, শ্রদ্ধা কর; তারই জোরে তোমাকে আমি অনুরোধ করছি, তুমি যেমন করে পার আমার এই কামনাটি সার্থক কর।

বিশ্বনাথ চুপ করে শুনছিল। চিন্তান্বিত মুখে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর বলল, আমি তো বলেছি, আপনি নিঃসহায় নন, নিঃসম্বল নন। গোলা বিক্রির টাকাটার সব খরচ হয় নি। এখনও শ দুই আছে। তা ছাড়া একটা জিনিস আপনাকে জানানো হয় নি। আমি নিজেও আগে জানতাম না। বাবা জানতেন। তিনিই এই ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্রজলাল ঐ পাঞ্জাবি মেয়েটাকে নিয়ে পালাবার পর, তেওয়ারী মশায়কে বলে এই বাড়িটা আপনার নামে উইল করিয়েছিলেন। বাবা যখন এই কাজ করিয়েছিলেন, তখন আইনের দিক দিয়ে যে এ ব্যাপারে কোন ত্রুটি ছিল না, নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাবা কাল আমাকে নিজে থেকেই সব বললেন। আরও বললেন, চিকিৎসার জন্য দেনা ছাড়া তেওয়ারী মশায়ের আরও কিছু দেনা আছে বাজারে। সব দেনা শোধ করে দেওয়া দরকার এই বাড়িটা বিক্রি করে দিলে সব দেনা শোধ করেও মোটা টাকা বাঁচবে। তাতে আপনার ওই ইচ্ছা পূর্ণ হতে অনেকটা সাহায্য করবে।

রাধা এই আশাতীত সুসংবাদে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে, বিহ্বল নয়নে তাকিয়ে রইল।

বিশ্বনাথ বলতে লাগল, ডাক্তার দাস তার নিজের গ্রামে একটা ব্যবস্থা করবার চেষ্টা করবেন, আমাকে বলেছিলেন। ওখানে তার নিজের বাড়ি এবং ওঁর দাদুরও বাড়ি। ওর দাদুর একমাত্র কন্যা ছিলেন ওর মা। তাঁর আর কোন ভাইবোন ছিল না। তাই দাদুর সমস্ত সম্পত্তি ওঁরা পেয়েছেন। দাদু গ্রামের জমিদার ছিলেন। কাজেই সম্পত্তি কম ছিল না। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে ডাক্তার দাস তাঁর দাদুর বাড়িতে তার মায়ের নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছেন। তাঁর এক ডাক্তার বন্ধু সেই চিকিৎসালয়ের ভার নিয়ে সেখানে বাস করছেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর বাবার নামে ছেলেদের ও মেয়েদের জন্য একটি হাই স্কুল ও দুটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। ওই স্কুলগুলির পরিচালনার ভারও ওই বন্ধুর উপরে। তিনি তাঁর বন্ধুকে ওখানকার মেয়েদের স্কুলে আপনাকে শিক্ষয়িত্রী

হিসাবে নেবার জন্য এবং আপনার ওখানে আজীবন বাসের ব্যবস্থা করবার জন্য তাঁর বন্ধুকে চিঠি লিখবেন বলেছিলেন। ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে বন্ধু যাতে আমাকে সংবাদটা জানাতে পারেন, সেজন্য ডাক্তার দাস আমার ঠিকানা জেনে নিয়ে তাঁর বন্ধুকে জানাবেন বলেছিলেন। আমি সেই চিঠিটার আশা করছি। যদি চিঠি এসে যায় তা হলে আপনাকে একদিন সেখানে নিয়ে যাব। আপনার যদি ওই ব্যবস্থা মনোমত হয় তো ওখানে গিয়ে থাকবেন। যদি গৌরদাস আর তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যান, তাতেও অসুবিধা হবে না।

রাধা চুপ করে শুনছিল। ভাবছিল, সে যদি এমন করে গৌরদাসকে ছেড়ে না আসত, তা হলে হয়তো তাকে ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে হত না। তাকে এই অবস্থায় দেখা অবধি তার বিবেক ক্রমাগত তিরস্কার করছে। তাকে যদি আবার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে, তা হলে বিবেকের কাছে সে দোষমুক্ত হতে পারবে। তা ছাড়া ওই ছেলেটিকে দেখা অবধি তার হারানো খোকা যেন ওর রূপ ধরে তার অন্তরের মধ্যে ফিরে এসেছে। তার অন্তরের এক কোণে যে বাৎসল্য অনাস্বাদিত হয়ে পড়ে আছে, তাই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ওই ছেলেটাকে যদি সে তার সমস্ত বাৎসল্য পান করিয়ে দিতে পারে, তা হলে খোকা পরিতৃপ্ত হবে। সেও তৃপ্তি পাবে।

বিশ্বনাথ চুপ করতেই রাধা বলল, অচিন্ত্যদা যদি আমার জন্য কিছু করেন তা তিনি নিজের গরজেই করবেন। তার জন্যে তাঁর প্রশংসা করবার কিছু নেই। ধন্যবাদ দেবারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমার বাবা আমার জন্য যা করেছেন, তুমি যা করেছ ও করছ, তার জন্য ধন্যবাদ না দিয়ে পারছি না।

বিশ্বনাথ বলল, বাবা আপনাকে স্নেহ করেন। আমি আপনাকে দিদির মত দেখি। কাজেই আমরাও যা করেছি নিজেদের গরজেই করেছি।

যাবার আগে বিশ্বনাথ একটা খাম তার হাতে দিতেই রাধা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। বিশ্বনাথ বলল, কিছু টাকা আছে। খরচপত্র আছে তো! একটু হেসে বলল, আমি দিচ্ছি না আপনারই টাকা।

॥ ৬ ॥

পরদিন সকালে মদনকে নিয়ে রাধা বাজারে গেল।

ব্রজলাল থাকতে কোথাও যাবার উপায় ছিল না। কড়া শাসন ছিল। কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল। গোপিয়া বলে একটা চাকর ছিল—সে-ই সর্বদা পাহারা দিত। ব্রজলালের দেশের লোক—একই জেলায় বাড়ি। ওর সামনে ব্রজলাল তাকে তিরস্কার করতেও ইতস্তত করত না। গোপিয়া মজা দেখত। অনেকবার মিথ্যে করে তার নামে ব্রজলালকে বলে, তাকে বকুনি খাওয়াত। ব্রজলাল নিরুদ্দেশ হবার পর রাধা তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বিশ্বনাথকে দিয়ে মদনকে আনিয়েছিল।

বাজারে তরিতরকারি, মসলাপাতি কিনল, একটা ধুতি আর গেঞ্জি কিনল গৌরদাসের জন্য। একটা হাফপ্যাণ্ট ও গেঞ্জি কিনল গোপালের জন্য। সংসারের আরও নানা জিনিস কিনল। তারপর মদন আর সে জিনিসগুলো একটা কুলির মাথায় চাপিয়ে, নিজেরাও কিছু কিছু নিয়ে, গৌরদাসেব আস্তানায় পেঁৗছল।

গৌরদাস বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তাকে দেখতে পেয়ে গোপাল বলে উঠল, বাবা, পিসীমা এসেছেন।

গৌরদাস উঠে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে আহ্বান জানাল, আসুন আসুন।

রাধা বলল, অত খাতির করতে হবে না আমাকে। তোমার রাধার চেয়ে ছোট আমি।

গৌরদাস বিস্ময়ের স্বরে বলল, রাধাকে জানতেন আপনি?

রাধা বলল, হ্যাঁ। একই শহরে একই পাড়ায় পাশাপাশি থাকতাম। আমার বাবাও স্কুলের মাস্টার ছিলেন। আমার নামও রাধা। সেই কারণে দুজনে খুব বন্ধুত্ব হয়েছিল।

গৌরদাস দৃষ্টিহীন সাদা চোখ মেলে রাধার দিকে তাকিয়ে রইল।

রাধা বলল, রান্নাবান্না এ বেলা হবে না বুঝি? কোন আয়োজন তো দেখছি না।

গৌরদাস বলল, সকালে তো রান্না করি না দিদি, একমুঠো করে মুড়ি খাই তুজনে। ভাত একবেলাই খাই। এই চলেছে আজ বছর কয়েক।

রাধা বলল, তুমি বৈষ্ণব মানুষ। উপোস করা অভ্যাস আছে। খোকার কিছু কষ্ট হয় না?

গৌরদাস বলল, ওরও অভ্যাস হয়ে গেছে। গরিবের ছেলেদের কত রকম অভ্যাস করতে হয়!

জিনিসগুলো একে একে কুলির মাথা থেকে নামাল মদন। খোকা আনন্দে চিৎকার করে উঠল, পিসীমা কত জিনিস এনেছেন দেখ বাবা। তোমার জন্যে ধুতি, আমার জন্যে প্যান্ট—আরও কত কী এনেছেন—

গৌরদাস ম্লান হেসে বলল, গরিবের উপর তোমার পিসীমার অশেষ দয়া। রাধা-মাধব ওঁর মঙ্গল করবেন।

রাধা গৌরদাসকে বলল, ঘরটা একটু পরিষ্কার করব। তারপর মদনকে বলল, জল নিয়ে আয় তো এক বালতি।

গৌরদাস বলল, বালতি কোথায় পাবেন এখানে!

রাধা বলল, আছে।

গোপাল বলে উঠল, বালতিও এনেছেন পিসীমা।

গৌরদাস বলল, এসব আবার নিয়ে এলেন কেন? তুজনেই বেরিয়ে যাই। কে নিয়ে পালাবে। তা ছাড়া আবার তো পথে বেরুতে হবে, তখন এ সব ফেলে রেখে যেতে হবে তো।

রাধা বলল, আর পথে বেরুতে হবে না। রাধার স্বামী ছেলে আমার চোখের সামনে ভিক্ষে করবে, আমি দেখতে পারব না। আমার যদি তু-মুঠো জোটে, তোমাদেরও জুটবে। বলে মদনকে উনুন ধরাতে বলল। তা দেখে খোকা রাধাকে জিজ্ঞাসা করল, উনুন ধরাচ্ছে কেন?

রাধা বলল, রান্না হবে যে।

খোকা বলল, আমাদের তো এবেলা রান্না হয় না।

আজ হবে।

এবেলাও ভাত খাব?

হ্যাঁ।

ওবেলা ?

ওবেলা খাবার পাঠিয়ে দেব—তাই খাবে।

কি খাবার ?

লুচি, তরকারি, সন্দেশ।

খোকা আনন্দে চোখ দুটো বড় করে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলতে লাগল, কাল—পরশু—তার পরদিন—তার পরদিন ?

রাধা বলল, হ্যাঁ, প্রত্যেক দিন।

খোকা বলল, আজ তা হলে ভিক্ষে করতে যাব না ?

রাধা বলল, না।

কাল ?

কোনদিনই যাবে না।

খোকা বলল, কি করব তা হলে ?

রাধা বলল, স্কুলে পড়তে যাবে।

খোকা বলল, গাঁয়ের ছেলেরা ওই গাঁয়ে যায় দেখেছি—তাদের সঙ্গে ?

রাধা বলল, হ্যাঁ।

রান্না করবার সময়ে খোকা সারাক্ষণ তার পাশে বসে রইল। নিজের মনে নানা গল্প করতে লাগল।

একসময়ে বলল, আপনি আমার বড়মাকে জানতেন ? তার বন্ধু ছিলেন আপনি ?

রাধা বুঝতে না পেরে বলল, কার ?

খোকা বলল, আমার বড়মার।

রাধা বলল, তোমার বাবা বুঝি তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে বড়মা বলতে ?

খোকা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ। বড়মার গল্প প্রায়ই করেন বাবা। মাথা নেড়ে, ভ্রূ নাচিয়ে চোখ বড় করে বলল, খুব লেখাপড়া জানতেন, খুব সুন্দরী ছিলেন। বাবার পাঠশালা ছিল তো, সেখানে বড়মা পড়াতেন। বাবার চেয়েও ভাল পড়াতেন। আচ্ছা মাসীমা—

রাধা হেসে বলল, পিসীমা থেকে মাসীমা হয়ে গেলাম কখন ?

খোকা বলল, বড়মার বন্ধু আপনি। আপনাকে মাসীমাই বলব। আমাকে আপনি পড়াবেন ? আমার পড়তে বড় ইচ্ছে করে।

রাধা বলল, তোমার বাবার কাছে পড় না কেন ?

খোকা বলল, কখন পড়ব ? সারাদিন তো বাইরে বাইরে কাটে। রাত্রে ? বাবা তো আবার রাত্রে একেবারেই দেখতে পান না।

মনে পড়ল রাধার। গ্রামের বাড়িতে রান্না করত রাধা। খোকা পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে গলা জড়িয়ে খাবার জন্য কেবল বায়না করত।

সে বুঝিয়ে বলত, রান্না করছি তোমার জন্যে। ওইটুকু ছেলে সব বুঝত, আর কিছু করত না। কাছটিতে বসে বসে এটা-ওটা নিয়ে খেলা করত।

খোকা বলে চলেছিল, এ বাড়িটায় বড় ভয় করে মাসীমা! কত বড় বাড়ি! রাত্রে-মনে হয় কারা ছুটোছুটি করে, কথা বলে। তা ছাড়া বড় বড় সাপ আছে। একদিন রাত্রে একটা সাপ বেরিয়েছিল। বাবা তো রাত্রে কিছু দেখতে পান না। আমিও মারতে পারলাম না।

গৌরদাস কতকটা দূরে বসেছিল। বলে উঠল, খোকা, ওঁকে বিরক্ত করছিস কেন ?

খোকা বলল, না বাবা, বিরক্ত করি নি। হ্যাঁ মাসীমা, বিরক্ত করছি ? বলে রাধার গায়ে হাত দিল।

রাধার মন এক মুহূর্তে ফিরে এল বর্তমানে। বলল, কই, না তো!

রান্না সারা হল। রাধা খোকাকে বলল, তোমার বাবাকে বল স্নান করে নিতে। তুমিও স্নান করে এস। আমার রান্না হয়ে গেছে।

গৌরদাস বলল, এর মধ্যে রান্না হয়ে গেল ?

দুজনে স্নান করে এল পুকুর থেকে। রাধা নতুন-কেনা ধুতি খোকার হাতে দিয়ে বলল, তোমার বাবাকে পরতে বল, আর তুমি তোমার জামা-প্যান্ট পর—কেমন ?

রাধা দুজনকে খেতে দিল। খেতে খেতে গৌরদাস বলল, অনেক দিন এত ভাল রান্না খাই নি। এ যেন রাধার হাতের রান্না!

রাধা বলল, সে ভাল রাঁধত বুঝি ?

গৌরদাস বলল, চমৎকার ! গরিবের ঘরে রাঁধবার ভাল জিনিস তো জুটত না, তবে সামান্য জিনিস তার হাতের গুণে অমৃত হয়ে উঠত ।

রাধা বলল, আজ যদি সেই রাধাই এসে রান্না করে দেয়, আজও কি অমৃত মনে হবে ?

গৌরদাস তার দৃষ্টিহীন চোখ দুটি রাধার মুখের দিকে তুলে বলল, হবে । তার দোষ কী ? তাব ভাগ্যের দোষ, আমার ভাগ্যের দোষ ।

খোকার খাওয়া শেষ হলে সে হাত ধুতে চলে গেল ।

রাধা বলল, তবু ঘর থেকে যে পথে নেমেছিল একদিন—হয়তো কত পাঁক, কত আবর্জনার মধ্যে ঘুরেছে—তবু নেবে তাকে ?

গৌরদাস দৃঢ়কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ । আমার রাধা-মাধবের পূজোর ফুল মাথায় ঠেকিয়ে দিলেই সব অশুচিতা ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যাবে তাব । একটু চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু আর কি আসবে সে ?' আসবে না । পৃথিবী থেকে চলে গেছে সে ।

বাধা চোখের জল মুছল । ভাবল, ধর্ম এর মুখের নয়, বুকের । বাইরের নয়, অন্তরের । কজন লোক আছে পৃথিবীতে, মেয়েদের অপরাধ এমন করে ক্ষমা করতে পারে !

কিছুক্ষণ পরে গৌরদাস বলল, বলতে বাধছে, আপনি—

রাধা বলল, আবার আপনি ।

গৌরদাস বলল, আচ্ছা তুমিই বলছি, তুমি কিছু খাবে না ?

রাধা বলল, আমি বাড়িতে গিয়ে খাব । আমার বান্না হচ্ছে ওখানে । একটা কথা, রাত্রে রান্না করবার দরকার নেই, খাবার পাঠিয়ে দেব ।

গৌরদাস বলল, তোমার দয়ার সীমা নেই । বড় কষ্ট হচ্ছিল কদিন—সারাদিন রোদে রোদে ঘুরতে । রাধা-মাধব তোমার মঙ্গল করুন ।

খাওয়া শেষ হলে গৌরদাস হাত-মুখ মুছতে লাগল । মসলার ঠোঙা থেকে দুটো লবঙ্গ-এলাচ এনে হাতে দিল রাধা ।

গৌরদাস বলল, এসবও এনেছ ? একটু ম্লান হেসে বলল, রাধাও ঠিক এমনই ছিল !

খাওয়ার পরই রাধা খোকার হাতে দুটো লবঙ্গ দিয়ে বলত, বাবাকে 'নন' দাও গে যাও। খোকা লবঙ্গকে 'নন' বলত। আজ অনেক দিন পবে মনে পড়ল সেই কথা। চোখেব সামনে সেই ছবিটা ভেসে উঠল একবাব।

গৌরদাস বলতে লাগল, চলে যাব দুদিন পরে। কোথায় যাব জানি না, তবে যাবার আগে তোমাব হাতেব যে যত্ন পেলাম তা অনেক-দিন মনে থাকবে।

বাধা বলল, এখনই বললাম যে অন্য কোথাও যেতে হবে না। আমাব কাছেই থাকবে।

গৌরদাস বলল, তোমাৰ স্বামী কিছু বলবেন না ?

বাধা বলল, আমার স্বামী নেই। এক ভাইয়ের কাছে থাকতাম। ভাই বিয়ে কবে বউ নিযে অন্য জায়গায় আছে। আমি ঠাকুব-চাকব নিয়ে এখানে থাকি। আমি চলে যাব শীগগির এখান থেকে। তোমাদেরও আমার সঙ্গে যেতে হবে। তা ছাডা খোকাকে আমাব বড় ভাল লেগেছে। ওকে আমি ছাডব না। ওকে আমি মানুষ কবব, লেখাপড়া শেখাব, ভদ্র-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করব।

গৌবদাস একটু চুপ কবে থেকে বলল, রাধা-মাধব তোমাব মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

॥ ৭ ॥

পরদিন সকালবেলা রাধা গৌরদাসের ওখানে গেল। গৌরদাস সকালেই স্নানাহ্নিক সেরে ফেলেছিল। কপালে তিলকমাটি দিয়ে তিলক আঁকা। তাকে দেখে খোকা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, বাবা মাসীমা এসেছেন।

উনুন ধরানো হয়ে গিয়েছিল। হাঁড়িতে জল ফুটছিল। গৌরদাস

একটা পাতার ঠোঙায় কতকগুলো চাল নিয়ে ধুচ্ছিল। এরপর সেগুলো সে জলে ছেড়ে দেবে। রাধা যেতেই হাতের কাজ বন্ধ করে বলে উঠল, আপনি!

রাধা ধমকে উঠল, আবার আপনি?

গৌরদাস ভুল শুধরে বলল, না না, তুমি। তুমি আজও এসেছ!

রাধা বলল, কাল যে আমার হাতের রান্নার প্রশংসা করলে। ওই লোভটা মেয়েমানুষের বড় লোভ। তাই আজও এলাম। আর যে কদিন এখানে থাকব সকালবেলায় মাঝে মাঝে এসে রান্না করে দিয়ে যাব। রাত্রে খাবার পাঠিয়ে দেব। তা হলে তোমাকে আর রোজ রোজ রান্না করতে হবে না। খোকাকে বলল, কাল রাত্রে খাবার খেয়েছিলে তো?

খোকা ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ।

ভাল লেগেছিল?

খোকা ভ্রূ নাচিয়ে বলল, খুব ভাল লেগেছিল, আজও পাঠিয়ে দেবেন তো?

বলেছি তো রোজ দেব। গৌরকে বলল, চালগুলো রাখ। আমি ব্যবস্থা করছি।

গৌর বলল, আমি তা হলে কী করব?

রাধা বলল, বসে বসে কীর্তন গাও না। তোমার কীর্তন অনেক-দিন শুনি নি।

গৌরদাস বলল, আমার কীর্তন আগে কখনও শুনেছিলে?

রাধা বলল, কাঁচামাটিতে। ওখানে আমারও মামার বাড়ি ছিল কি না। প্রেমদাস বাবাজী আমার দাদুর বন্ধু ছিলেন। আমিও ওঁকে দাদু বলতাম। রাসপূর্ণিমায় একবার ওখানে ছিলাম। তখন তোমার কীর্তন শুনেছিলাম।

গৌরদাস বলল, ভাল লেগেছিল?

রাধা বলল, হ্যাঁ।

রাধা রান্না করতে বসল। গৌরদাস গান ধরল। খোকাও তার

সঙ্গে গাইতে লাগল।

মনে পড়ল রাধার। সন্ধ্যেবেলায় কীর্তন করত গৌরদাস। পাড়ার সকলে আসত শোনবার জন্য। মন্দিরের চাতালে চন্দ্রা ভাবে বিভোর হয়ে গৌরদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকত।

সে রান্নাঘরে রান্না করত বসে বসে। চন্দ্রা তাকে কতদিন যাবার জন্য টানাটানি করত। সে বলত, আমার তো বসে বসে গান শুনলে চলবে না ভাই, রান্না এখনও বাকী।

আর এক দিনের কথা মনে পড়ল রাধার। সংসারে তখন খুব অভাব চলছে। গৌরদাস তখনও কীর্তন গাইত। একদিন সে ওকে বলল, এত ভাল কীর্তন গাও, কোন শহরে গিয়ে বড়লোকের বাড়িতে বাড়িতে গাইলে দুটো পয়সা আসবে।

গৌরদাস বলল, ঠাকুরের নাম বিক্রি করে বেড়াব?

সে বলল, তাতে দোষ কী? লোকে লেখাপড়া শিখে পরের ছেলেদের পড়িয়ে টাকা নেয় না? তুমি একটা বিদ্যে শিখেছ—যা লোকের ভাল লাগবে, যা শুনে লোকে আনন্দ পাবে। তার বদলে পয়সা নেবে না? কত লোকই তো ওই রকম ভাবে রোজগার করে।

গৌরদাস জবাব দিল, লোকে যা করে করুক, আমি পারব না।

গান শেষ হল। গৌরদাস জিজ্ঞাসা করল, কী? ভাল লাগল?

রাধা বলল, হ্যাঁ। একটু চুপ করে বলল, এই গান যদি শহরে গাইতে তা হলে শহরের লোকেরা বাড়িতে ডেকে পয়সা দিয়ে শুনত।

গৌর বলল, ভেবেছি অনেকবার, সুযোগ হয় নি। তা ছাড়া বড়লোকদের বাড়িতে পাত্তা পেতে হলে সাজপোশাক চাই। কথায় বলে না—আগে দর্শনধারী তবে গুণবিচারী--এও তাই। এই চেহারা, এই পোশাক নিয়ে কোন বড়লোকের বাড়ির দরজায় দাঁড়ালে দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।

রাধা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, আমি শীগগির এখান থেকে চলে যাব। এখান থেকে অনেক দূরে একটা গাঁয়ের

মেয়ে-স্কুলে মাস্টারনীর চাকরি পাব আমি। থাকবার জায়গাও পাওয়া যাবে। তোমরা আমার সঙ্গে যাবে তো?

গৌরদাস বলল, রাধা-মাধবের ইচ্ছে হয় তো যাব।

রাধা ছেলেটিকে ডাকল, গোপাল।

গোপাল একটু দূরে দাঁড়িয়ে কি করছিল। এসে একেবারে কোল ঘেঁষে বসল। মায়ের স্নেহ বেশী পায় নি। মাতৃস্নেহের তৃষা ওর চোখে মুখে ফুটে উঠল।

খোকাকে রাধা বুকের কাছে টেনে নিল। খোকা চুপি চুপি বলল, আপনাকে মা বলব, মাসীমা বলতে ভাল লাগে না।

রাধা বলল, তাই বলো।

রাধা খোকাকে জিজ্ঞাসা করল, আমার সঙ্গে যাবে তো?

খোকা ঘাড় নেড়ে দীর্ঘ টান দিয়ে বলল, হুঁ—

রাধা বলল, যদি তোমার বাবা না যান?

খোকা গৌরদাসকে বলল, হ্যাঁ বাবা, যাবে না মায়ের সঙ্গে?

গৌরদাস বলল, তোর মায়ের সঙ্গে যেতে পারলে তো বেঁচে যেতাম বাবা। এত কষ্ট সহ্য করতে হত না।

খোকা বলল, সে মা নয়, আমার এই মায়ের সঙ্গে যাবে কিনা বল?

চুপ করে রইল গৌরদাস।

গৌরদাসের জবাব না পেয়ে বলল, তুমি না যাও, আমি চলে যাব।

গৌরদাস বলল, আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবি?

খোকা বলল, হুঁ।

গৌরদাস দৃষ্টিহীন চোখ দুটি রাধার দিকে রেখে মৃদু হেসে বলল, তবে আবার কি! কান পাকড়ে যখন ধরেছ, যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পার।

॥ ৮ ॥

সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথ এল। বলল, আজ রোগীর ভিড় ছিল খুব। কলিয়ারি থেকে একটা ডাক এসেছিল। কর্তার সিংয়ের বাড়ি

থেকে। সময় হল না বলে যেতে পারলাম না।

রাধার চেনা লোক। কর্তার সিং মানে যে মেয়েটিকে ব্রজলাল নিয়ে পালিয়েছে, তার বাবা। জিজ্ঞাসা করল, ওর নিজের অসুখ নাকি?

বিশ্বনাথ বলল, না ওর মেয়ের।

সবিস্ময়ে রাধা বলল, ওর আরও মেয়ে আছে নাকি!

বিশ্বনাথ বলল, না।

রাধা বলল, তবে?

বিশ্বনাথ একটু চুপ করে থেকে বলল, এর মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটে গেছে, আপনাকে বলা হয় নি। সে মেয়েটি, মানে, কমলা ফিরে এসেছে।

সভয়ে রাধা বলল, তাই নাকি! ব্রজলালও!

বিশ্বনাথ বলল, না। ও একাই এসেছে। নিজে আসে নি। কর্তার সিংয়ের লোকেরা কেড়ে নিয়ে এসেছে। ব্যাপারটা এই। ব্রজলাল বিলাসপুরের কাছে চিরিমিরি বলে একটা জায়গায় ছোটখাট কাঠের গোলা করে মেয়েটিকে নিয়ে বাস করছিল। এখানে ওর দলের লোকেরা খবরটা জানত। কর্তার সিংকে কেউ কিছু বলে নি। তাদের মধ্যে একজন পাঞ্জাবি ছিল। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে কর্তার সিংকে খবরটা জানিয়ে দিল! কর্তার সিংয়ের লোকেরা ওখানে গিয়ে ব্রজলালের কাঠের গোলাটা আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। ব্রজলালকে মারধোর করেছে, মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে চলে এসেছে।

রাধা চুপ করে বসে রইল। একটু থেমে বলল, তা হলে ব্রজলাল তো আবার এখানে আসতে পারে?

বিশ্বনাথ বলল, খুব সম্ভব।

রাধা বলল, ভাই, আমার ব্যবস্থাটা তাড়াতাড়ি করে দাও। ও এখানে আসবার আগে আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। ও এসে পড়লে আমি যা কিছু আশা করেছি সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে। একটু চুপ করে থেকে বলল, সারাটা জীবন আমার এমনই কেটে গেল—

কোন সাধ কোনদিন মিটল না। আমার শেষ সাধ—গৌরদাস আর তার ছেলেটির জন্য ঘর বেঁধে দেওয়া। যেন এই বয়সে ও বেচারাকে আর পথে পথে ঘুরতে না হয়, যেন ওকে শেয়াল-কুকুরের মত পথের ধারে মরতে না হয়। ওই ছেলেটাকে যেন এখন থেকে ভিক্ষাবৃত্তি করে সারাজীবন পথে পথে না কাটাতে হয়। লেখাপড়া শিখে আর পাঁচজন ভদ্রঘরের ছেলে যেমন করে জীবন কাটায়, ও যেন তেমনই জীবন কাটাতে পারে।

বিশ্বনাথ বলল, আমি চেষ্টা করছি দিদি। বাবা কাল শহরে যাবেন বলেছেন বাড়িটা বিক্রির ব্যবস্থা করতে। যে কিনবে তার সঙ্গে ওঁর আগেই কথাবার্তা হয়ে গেছে। ডাক্তার দাসের গ্রাম থেকে চিঠির আশা করছি শীগগির। সব ব্যবস্থা শেষ হতে একটু দেরি হবে। ব্রজলাল যদি এসে পরে—সে হয়তো গোপনেই আসবে, লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াবে, প্রকাশ্যে আপনার এখানে আসবে বলে মনে হয় না। তা হলেও আমি শিউশরণকে বলে যাচ্ছি। ও যেন লক্ষ্য রাখে। ও তো পুরনো লোক। আপনাকে ভালবাসে।

রাধা বলল, মদন শিউশরণ দুজনেই ভালবাসে আমাকে।

বিশ্বনাথ চলে গেল। রাধা ব্রজলালের কথা ভাবতে লাগল বসে বসে।

সুন্দর সুঠাম দেহ। মনটা পাষাণের মত কঠিন ও নির্মম। তাকে তেওয়ারী যে কিনে নিয়ে এসেছিল, জানা ছিল ওর। ক্রীতদাসীর মতই ব্যবহার করত। উঠতে বসতে ধমক, তিরস্কার, অপমান। ঠাকুর-চাকরের সামনে মেরেছে কতবার। গোপিয়া হাসত, কিন্তু শিউশরণ তাকে সান্ত্বনা দিত। তেওয়ারীর স্ত্রীকে জানালেও সে ব্রজলালকে কিছু বলত না। বরং তাকে বোঝাতেন মেয়েমানুষদের পুরুষের মারধোর সহ্য করতেই হয়। তেওয়ারী তাকে কতবার মেরেছে, সে মুখ বুজে সহ্য করেছে। তাও সে তো স্ত্রী—অর্থাৎ বলতে চাইত ক্রীতদাসীর মারধোর ন্যায্য পাওনা। ব্রজলাল যখন মদ ধরল, মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত। গোপিয়াকে দিয়ে তাকে ডেকে পাঠাত।

সে যেতে চাইত না। কিন্তু না গিয়েও উপায় থাকত না। ঠাকুর-চাকরের সামনেই কামার্ত পশুর মত তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তার উপর চরম নির্যাতন চালাত। পরদিন মদের নেশা কেটে গেলেও তার ব্যবহারে অনুশোচনার লেশ মাত্র ফুটে উঠত না।

ব্রজলালই এখানকার সর্বে-সর্বা ছিল। তার পরিচালনায় কাঠের ব্যবসার খুব উন্নতি হয়েছিল। চারদিকের কলিয়ারিগুলোতে কর্তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে কাঠের বিক্রি সে খুব বাড়িয়েছিল। চালের আড়তে যা আয় হত তা তেওয়ারীর এখানকার খাওয়া-দাওয়া ফুর্তি আমোদ ইত্যাদিতে সব খরচ হয়ে যেত। ব্রজলালের আয়েই এখানকার সংসার চলত। কাজেই ঠাকুর-চাকর তার কাছে তটস্থ হয়ে থাকত। তেওয়ারী ও তেওয়ারী-গিন্নী তাকে বাহবা দিত অনবরত। সে যাই করুক কিছু বলত না। কাজেই সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করা ছাড়া তার কোন উপায় ছিল না। আশ্রয়ও তো আর কোথাও ছিল না! আশ্রয় জুটলেও বিনা মাইনের চাকরানীকে এরা নিশ্চয় ছাড়তও না। বিশ্বনাথ বা তার বাবাকেও সে এ সব জানায় নি। কারণ তাতে কোন ফল হত না। মিথ্যে নিজেকে আরও ছোট করা হত।

তেওয়ারীর মৃত্যুর পর আবার সে নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয় হয়েছে। তবে এবার সে একেবারে নিঃসহায় হয়ে যায় নি। বিশ্বনাথ ও বিশ্বনাথের বাবা, অচিন্ত্যদা সবাই এবার তাকে তীরে তোলবার চেষ্টা করছে। যে দুর্ভাগ্যের অন্ধকার তাকে এতদিন ধরে ঘিরে রেখেছে, তার মধ্যে যেন একটি প্রদীপ হঠাৎ জ্বলে উঠেছে। তারই ক্ষীণ শিখা অন্ধকারকে একটু ফিকে করে তুলেছে। জীবনের পথটা দেখা যাচ্ছে কতকটা। সঙ্গীও জুটেছে পথ চলবার। এখন কোন রকমে এই শিখাটি যদি টিকে থাকে তা হলে সে তারই ক্ষীণ আলোতে হয়তো সঙ্গীদের নিয়ে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুতে পারে।

আর যদি হঠাৎ ব্রজলাল এসে পড়ে তো সব পণ্ড হয়ে যাবে।

সে কোন কথা শুনবে না, কোন কথা বুঝবে না, ক্রীত দ্রব্যের উপর ক্রেতার অবিসংবাদিত অধিকারে তাকে ওর সঙ্গে কোন দূর দেশে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর সেই স্নেহহীন সহায়হীন অজানা দেশে অচেনার সঙ্গে বাকী জীবনটা ব্রজলালের সেবা করে কাটাতে হবে। সামান্য খাদ্য, পরিধেয় ও আশ্রয়ের পরিবর্তে ব্রজলাল ইচ্ছেমত তার দেহটাকে মাংসের টুকরোর মত চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে।

শিউশরণ এসে বলল, দিদি, খেয়ে নেবে চল। অনেক রাত হয়ে গেছে।

॥ ৯ ॥

পরদিন সন্ধ্যের পর বিশ্বনাথ এল। বলল, আজ কর্তার সিংয়ের বাড়ি গিয়েছিলাম। মেয়েটিকে দেখলাম। মুখখানি শুকনো। আগের চেয়ে কাহিল হয়ে গেছে। ব্রজলালের কাছে খুব ভাল ছিল বলে মনে হয় না। এখানে বাবাব কাছে খুব আদরে থাকত।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, কর্তার সিং কী বলল ?

বলল অনেক কিছু। মেয়েটির ভাল পাত্র জুটেছে। দেশের ছেলে। ম্যানেজারী পাস করেছে। কাছেই একটা কলিয়ারিতে কাজ করছে এখন। আবও ভাল কাজের চেষ্টা হচ্ছে। পাবেও নাকি। পায়ার জোর আছে। তা ছাড়া পাঞ্জাবীদের তো কলিয়ারি এলাকায় আজকাল একাধিপত্য। হাজার টাকা নাকি মাইনে হবে।

বাধা বলল, বিয়েটা হচ্ছে কবে ?

হবে শীগগির।

রাধা বলল, ব্রজলালের কথা কী বলল ?

অনেক কিছুই বলল। জানে তো আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে। বলল, এ এলাকায় যদি পা দেয়, প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। পাঞ্জাবীরা ওকে শুয়োর মারা করবে। শেয়ালের বাচ্চা হয়ে সিংহের বাচ্চার উপরে হাত দেওয়ার স্পর্ধার সমুচিত শাস্তি দিয়ে দেবে।

ব্রজলালকে তো ওরাই ঘরে ঢুকিয়েছিল ? বলল রাধা।

ব্রজলালের অনেক পয়সা আছে ভেবে ঢুকিয়েছিল। কিন্তু যে লোকটা বলবামাত্র দু হাজার টাকা বার করতে পারে না, তার উপরে ওদের আর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, দু হাজার টাকা কী জন্যে চেয়েছিল? মেয়ের দাম?

বিশ্বনাথ বলল, দাম নয়, সেলামী। দাম পরে দিতে হবে। সিংয়ের তো নিজের মেয়ে নয়, পালিতা মেয়ে। ছোট ভাইয়ের মেয়ে। মা নেই, বাবা আছে। সেও বিশেষ কিছু করে না। সিংয়ের কাছেই থাকে। ওদের খাওয়াতে-পরাতে তার খরচ তো কম হয় নি। কাজেই এ সব তার ন্যায্য পাওনা।

পাঞ্জাবী ছেলেটি কি এসব দেবে?

দেবে মানে? দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। মাইনের অর্ধেক পূজ্যপাদ শ্বশুরমশায়ের হাতে তুলে দিচ্ছে। মেয়েকে ভাল ভাল পোশাক, দামী দামী গয়না প্রায়ই উপহার দিচ্ছে; প্রত্যেক রবিবার রাত নটার শো-তে সিনেমা দেখাচ্ছে—অবশ্য মেয়ের বাবার হেপাজতে। বলে বিশ্বনাথ চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

রাধা দেখেছে মেয়েটিকে। চমৎকার দেখতে। লম্বা, ছিপছিপে। ফরসা রঙ। পরনে সালোয়ার। লাল রঙের পাঞ্জাবি। সবুজ রঙের ওড়না। লম্বা বেণী দুলছে পিঠে। সাইকেলে চড়ে মাইল পাঁচেক দূরে একটা মেয়ে-স্কুলে রোজ পড়তে যেত। মেয়ের বাবা যেত সঙ্গে।

ব্রজলালের যাতায়াত ছিল ওদের পল্লীতে। দু হাতে টাকা খরচ করত। বন্ধু-বান্ধব জুটেছিল অনেক। আড্ডা বসত রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত। খরচ আসত ব্রজলালের পকেট থেকে। ওইখানেই মদ খেতে শিখেছিল ব্রজলাল। আরও অনেক কিছু শিখেছিল। পয়সাওয়ালা লোক বলে সুনাম হয়ে গিয়েছিল সারা পল্লীতে। কাজেই তাকে ঘরে ঢুকিয়েছিল কর্তার সিং। মেয়েটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওর হাতে ছেড়ে দিতেও দ্বিধা করত না।

একটা দিনের কথা মনে পড়ল। রাত দুপুর। তেওয়ারী-গিন্নী

ঘুমিয়ে পড়েছে। সেও মেঝেতে একটা মাত্বর বিছিয়ে শোবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় গোপিয়া এসে বলল, ছোট সাহেব ডাকছে, জলদি এস।

ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে গেল। কী মেজাজে এসেছে কে জানে! মদ খেয়ে এলে তো সব রকম অত্যাচারই চলত। ভয়ে ভয়ে বাইরে গিয়ে দেখল ব্রজলাল বাইরে দাঁড়িয়ে, পাশে মেয়েটি।

ব্রজলাল হুকুম দিল কড়া গলায়, আলো জ্বেলে আমার বিছানা ঠিক করে দাও।

সে নীরবে আদেশ পালন করে চলে এল। মেয়েটি বোধ হয় তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ব্রজলাল জোর গলায় অবজ্ঞার সুরে বলল, চাকরানী। এমনি নয়—অনেক টাকা দিয়ে কেনা।

বিশ্বনাথ একটুখানি চুপ করে থেকে বলল, ব্রজলালও চুপ করে বসে নেই। ওর দলের একটা লোক সেদিন আমার কাছে এসেছিল। প্রায়ই আসে ইনজেকসান নিতে। বলল, ব্রজলাল ওদের দলের লোকদের বলে পাঠিয়েছে, মেয়েটাকে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে চেষ্টা করতে। অনেক টাকা দেবার লোভ দেখিয়েছে। বলে পাঠিয়েছে, বাড়ি বিক্রির সব টাকা দিয়ে দেবে ওদের। চেষ্টা শুরু হয়ে গেছে।

রাধা সবিস্ময়ে বলে উঠল, বাড়ি! কোন্ বাড়ি?

বিশ্বনাথ ম্লান হেসে বলল, এই বাড়ি। এটা ওরই প্রাপ্য বলে জানে তো। এর মধ্যে যে এসব ব্যাপার ঘটে গেছে তা তো জানে না।

ভয়ে রাধার মুখ শুকিয়ে গেল। বলল, ও তো তা হলে শীগগির এসে পড়বে?

বিশ্বনাথ বলল, খুব সম্ভব।

রাধা বলল, এসে সব শুনবে আর তোমার আমার ওপর চটবে। তোমার তো কিছু করতে পারবে না। আমার ওপর চলবে নির্যাতন। যদি একেবারে মেরে ফেলে তো সব যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাই। কিন্তু তা তো করবে না। টেনে নিয়ে যাবে ওর সঙ্গে, তারপর যতদিন না মৃত্যু হবে ততদিন সেই দুর্গতির দুঃসহ জীবন চলতে থাকবে।

বিশ্বনাথ বলল, আমিও ভেবেছি সব। কারখানার ম্যানেজারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে। ওঁকে আমি আপনার অবস্থাটা বলেছি। উনি বলেছেন, কোন বিপদ হলে ওঁকে যেন খবর দেওয়া হয়। উনি সঙ্গে সঙ্গে লোক পাঠিয়ে দেবেন।

রাধা বলল, কে ওঁকে খবর দেবে ভাই। শিউশরণ তো ব্রজলালকে ভয়ানক ভয় করে। ওকে দেখলে আর নড়তে পারে না। বাকী থাকে মদন। ও কি পারবে?

দুজনে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। রাধা বলল, মেয়েটার মনের ভাব কী?

বিশ্বনাথ বলল, গয়নাগাঁটি কাপড়-চোপড় পেলে মেয়েদের মন একটু নরম হয়। যতদূর শুনেছি, ব্রজলালের উপর একটু টান থাকা সম্ভব। তবে ও ব্রজলালের সঙ্গে যাবে বলে মনে হয় না। খুব খেলোয়াড় মেয়ে। ব্রজলালের আগে আরও দু-একজনকে নাকি খেলিয়েছে। ধরা দেয় নি কারও কাছে। কথাটার মোড় ফিরিয়ে দেবার জন্য বিশ্বনাথ বলল, গৌরদাসদের খবর কী?

রাধা বলল, ভালই আছে। আমি সকাল বেলায় গিয়ে রান্না করে দিয়ে আসি। রাত্রে খাবার পাঠিয়ে দিই। ছেলেটিব খুব ফুর্তি হয়েছে।

বিশ্বনাথ বলল, মা প্রায়ই ওদের ডেকে গান শোনেন! ওরা চমৎকার গান গায়! রেডিওতে যারা গান গায় তাদেরই মতন। সুযোগের অভাবে এরা এমন ভাবে নষ্ট হচ্ছে, এত কষ্ট পাচ্ছে।

রাধা বলল, বেশ তো, সুযোগ করে দাও না গৌরদাসকে। ছেলেটার এখন ওসব করে কাজ নেই। লেখাপড়া শিখুক আগে।

বিশ্বনাথ বলল, ও তো কলকাতা না গেলে হয় না। মফস্বলে ওর কোন ব্যবস্থা নেই।

রাধা চুপ করে থেকে বলল, তোমাদের পাঁচজনের চেষ্টাতে দুর্ভাগ্যের আকাশজোড়া কালো মেঘের একপাশে একটু আশার আলো ফুটে উঠেছিল। ব্রজলাল যদি এসে পড়ে তো সেটুকু মুছে গিয়ে আবার সেই

কালো মেঘ আকাশ জুড়ে আসর জমিয়ে বসে থাকবে। কবে যে মরণ হবে জানি না!

॥ ১০ ॥

দিন কয়েক কেটে গেল। এর মধ্যে রাখালবাবুর চেষ্টায় বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে। রাখালবাবু ও বিশ্বনাথের সঙ্গে রাধাকে শহরে যেতে হয়েছিল বাড়ি বিক্রির দলিলে সই করার জন্যে। রাখালবাবু দেনা শোধের ব্যবস্থা করেছেন। বাকী টাকা ব্যাঙ্কে বিশ্বনাথের নামে জমা আছে।

একদিন সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ এসে বলল, ডাক্তার দাসের বন্ধু ডাক্তার আদিত্য রায়ের কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাদের যেতে লিখেছেন। কাল যাওয়া যাবে।

পরের দিন বিশ্বনাথের মোটরে ওরা গেল। সামনের রাস্তা দিয়ে আগে শহরে যেতে হল। শহর পার হয়ে একটা বড় রাস্তায় পড়ল সেই রাস্তা ধরে প্রায় পঞ্চাশ মাইল গিয়ে গ্রামে পৌঁছল। বড় গ্রাম গ্রামের মধ্যে ঢুকে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল। অনেকটা জায়গা জুড়ে বাড়ির হাতা। চারদিকে উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। সামনে একটা ফটক। দরজা নেই। ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। কতকটা গিয়ে একটা একতলা বাড়ি। সামনে বারান্দা। অনেক লোকের ভিড়! বাড়িটার গায়ে একটা কাষ্ঠ-ফলকে লেখা রয়েছে—'হেমাঙ্গিনী দাতব্য ঔষধালয়'। বিশ্বনাথ রাধাকে বলল, ডাক্তার দাসের মায়ের নামে এই দাতব্য ঔষধালয়। ওঁর মাকে আপনি দেখেছিলেন? রাধা বলল, খুব ছেলেবেলায় দেখেছিলাম। ভাল মনে নেই।

খবর দিতেই ডাক্তারবাবু এলেন। লম্বা, দোহারা গঠন, শ্যামবর্ণ। বয়স চল্লিশ ও পঞ্চাশের মাঝামাঝি। মুখ দেখলেই মনে হয়, সদাশয় প্রকৃতির মানুষ। মাথার চুল পাতলা, সামনেটায় টাকের আক্রমণ শুরু

হয়েছে। পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির ঝুলটা হাঁটু পর্যন্ত নেমেছে। পায়ে সাধারণ জুতো। এদের দেখেই দূর থেকে মুখে আপ্যায়নের হাসি ফুটিয়ে তুললেন। কাছে এসেই নমস্কার করে বিশ্বনাথকে বললেন, আপনিই বিশ্বনাথবাবু তো?

বিশ্বনাথ ও রাধা নমস্কার করল। বিশ্বনাথ বলল, আপনার চিঠি কাল পেয়েছি। ইনি খুবই ব্যস্ত হয়েছেন, তাড়াতাড়ি চলে আসতে চান।

আদিত্যবাবু বললেন, চাকরির ব্যবস্থা তো হয়েই গেছে। উনি পরের মাস থেকে কাজে যোগ দিতে পারেন। এ মাস তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আর সাত-আটদিন বাকী। এর মধ্যে যে কোন দিন চলে আসবেন।

বিশ্বনাথ বলল, থাকবার ব্যবস্থা?

আদিত্যবাবু বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। বসবেন চলুন। আমি সব বলছি।

বাড়িটার পিছন দিকে নিয়ে গেলেন তাদের। পিছনে যেতেই সামনে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি চোখে পড়ল। বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল, ঐটাই তো আসল বাড়ি? এ বাড়িটায় কী হত?

আদিত্যবাবু বললেন, যতদূর শুনেছি, এটা কাচারি বাড়ি ছিল। বেশ বড় জমিদার ছিলেন তো। অনেক কর্মচারী সেরেস্তায় কাজ করত। এখানেই থাকত সব। হাত বাড়িয়ে একটু দূরে একসারি ছোট ছোট ঘর দেখিয়ে বললেন, ওখানটায় রান্না হত আর চাকর-বামুনরা থাকত। এখন অফিসটাতে হয়েছে দাতব্য ঔষধালয়। ম্যানেজারবাবুর জায়গায় আমি থাকি, আর কেরানীবাবুদের জায়গায় কম্পাউণ্ডারবাবুরা থাকেন। ওই ঘরগুলোতে আগেও যা হত, এখনও তাই হচ্ছে।

বিশ্বনাথ বলল, দোতলা বাড়িটায় কি স্কুলের ব্যবস্থা হয়েছে?

আদিত্যবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। দোতলায় হাই-স্কুল, নীচের তলায় ছেলেমেয়েদের প্রাইমারী স্কুল। পাশের একতলা বাড়িটায়

খানকয়েক ঘর আছে। ওখানে মেয়ে-স্কুলের কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী থাকেন। এঁরও সম্প্রতি ওখানেই থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বিশ্বনাথ বলল, উনি তো একা নন। ওঁর সঙ্গে আরও দুজন আত্মীয় আছেন।

আদিত্যবাবু বললেন, তাই নাকি? কই, অচিন্ত্য আমায় তা তো লেখে নি! একটু ভেবে বললেন, আত্মীয়দের বয়স কত?

বিশ্বনাথ বলল, একজন প্রায় আপনার বয়সী, আর একটি আট-ন বছরের ছেলে।

আদিত্যবাবু বললেন, তা হোক। ওতে অসুবিধা হবে না। সাময়িক ব্যবস্থা তো—এক রকম করে চলে যাবে।

নিজের বসবার ঘরে বসালেন তাদের। মাঝারি গোছের ঘর। একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার ও বেঞ্চি রয়েছে। টেবিলের উপরে লেখার সাজ-সরঞ্জাম। একপাশে একটা বড় আলমারি—ডাক্তারী বইয়ে ভর্তি। একটা তেপায়ার উপরে অনেকগুলো ডাক্তারী মাসিকপত্র। জানলার সামনে একটা ইজিচেয়ার।

বিশ্বনাথ ও রাধা চেয়ারে বসল। আদিত্যবাবু বললেন, আপনারা কি স্নানাহার করে বেরিয়েছেন?

বিশ্বনাথ বলল, হ্যাঁ, আমরা সব সেরে বেরিয়েছি, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আদিত্যবাবু বললেন, তা হোক, এতদূর এসেছেন, একটু মুখ-হাত ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন। তারপর কী ব্যবস্থা হয়েছে আমি জানাচ্ছি। বলেই বেরিয়ে গেলেন।

বিশ্বনাথ রাধাকে বলল, বেশ ভাল লোক। এঁর কাছে আপনি নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারবেন।

হাতমুখ ধোয়ার ব্যবস্থা হল অবিলম্বে। ওরা হাতমুখ ধুয়ে এসে বসতে না বসতে চাকরের হাতে এল খাবার। খাওয়ার পর আদিত্যবাবু বিশ্বনাথকে বললেন, চা খান তো?

বিশ্বনাথ বলল, আমি খাই, উনি খান না।

বিশ্বনাথের চা এল। আদিত্যবাবু এবার টেবিলের ওপাশে গিয়ে চেয়ারে বসলেন, ওঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে অচিন্ত্যদের নিজের বাড়িতে। বাড়িটা খুব বড় নয়—তিন-চারখানা ঘর। পুরনো হয়েছে, ভেঙে-চুরে গেছে। অচিন্ত্যরা তো অনেকদিন দেশ-ছাড়া। বহুদিন দেখাশোনা হয় নি। তবে মেরামতের ব্যবস্থা হচ্ছে। মাসখানেকের মধ্যে বাসের যোগ্য হয়ে উঠবে।

একটু চুপ করে থেকে আদিত্যবাবু বললেন, ওই বাড়িটা অচিন্ত্য রীতিমত আইনসঙ্গত ভাবে এঁকে দান করে দিয়েছে। আর লিখেছে ঃ ড্রয়ার থেকে একটা চিঠি বার করে পড়তে লাগলেন—রাধা আমার নিজের বোনের চেয়েও বেশী। আমি এখানে থাকলে সানন্দে ওর সমস্ত ভার বহন করতাম। কিন্তু আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। তুমি আমার নিজের ভাইয়ের মত। তোমার হাতেই ওর সমস্ত ভার দিয়ে গেলাম। ওকে তুমি নিজের বোনের মতই কাছে টেনে নিযো। যতদিন বাঁচবে কাছে কাছে রেখ। ওর কোন অসুবিধা, কোন কষ্ট না হয় লক্ষ্য রেখ। বিদেশে গিয়েও নানা চিন্তার মধ্যে ওর চিন্তাও আমার অবশ্যকর্তব্য হয়ে থাকবে।

রাধা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিযে তাকিয়ে শুনছিল। তার কানের মধ্যে মনের মধ্যে অমৃতসিঞ্চন হচ্ছিল।

একটা কথা মনে পড়ল রাধার।···

মাসীমা রান্না করছেন। অচিন্ত্যদা কাছে বসে গল্প করছেন।

মাসীমা বললেন, হ্যাঁ বাবা অচিন্ত্য, জামাইবাবুর তো কোন দিকে কিছু খেয়াল নেই। রাধার বিয়ের কী হবে? বয়স তো কম হল না।

অচিন্ত্যদা বললেন, কত বয়স হল ওর?

মাসীমা বললেন, ষোলয় পা দিয়েছে বোধ হয়।

কাছেই সে দাঁড়িয়ে ছিল। হাসি-হাসি মুখে তার দিকে তাকিয়ে অচিন্ত্যদা বললেন, ষোলয় পা দিয়েছে! দেখে তো মনে হয় না!

মাসীমা ক্ষোভের স্বরে বললেন, ওই রকমই ওর গড়ন। খাচ্ছেদাচ্ছে আর মাথায় বাড়ছে, গায়ে মাংস নেই। কী করব বল? বলেই মাসীমা কী কাজে উঠে গেলেন।

তার দিকে তাকিয়ে অচিন্ত্যদা ধমকের সুরে বললেন, গায়ে মাংস নেই কেন ? ওপর দিকে না বেড়ে পাশে বাড়তে পার না ? হাত্তির মত দেখতে হবে তবে তো খাতির বাড়বে। বরের দল ভিড় করে দাঁড়াবে চার পাশে।

সে বলল, আমি তো ভিড় চাই না।

চাও না ? বলে অচিন্ত্যদা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে।

চোখে চোখ মিলতেই বুকের ভিতরে তার কাঁপন ধরল। জোর করে কণ্ঠস্বর স্থির রেখে সে বলল, না।

কী চাও ?

জানি নে, যান।

* * * *

আদিত্যবাবু রাধাকে বললেন, আমি আপনার দাদার মত। আমার কাছে কোন লজ্জা সঙ্কোচ করবেন না। আপনি চলে আসুন এখানে যত শীগগির পারেন। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আপনার কোন কষ্ট বা অসুবিধা হতে দেব না।

আরও নানা গল্প হল। আদিত্যবাবু নিজের জীবনের পূর্ব-ইতিহাস বলতে লাগলেন। পূর্ববঙ্গে বাড়ি। কলকাতায় পড়তেন। সেই সময় অচিন্ত্যর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। মেডিকেল কলেজে একই ক্লাসের ছাত্র ছিলেন দুজনে। একই হোস্টেলে একই ঘরে সাত-আট বছর কাটিয়েছিলেন। পাস করে দুজনেই মেডিকেল কলেজে হাউস-সার্জেন হয়েছিলেন। বরাবর কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। মহাত্মার 'লবণ আন্দোলনে'র সময় স্কুলে পড়তেন। তখনই মাস ছয় জেলে ছিলেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনেও যোগ দিলেন। এক বছরের জন্য জেল হল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের শহরে গিয়ে প্র্যাকটিশ শুরু করলেন। প্র্যাকটিশ জমে উঠল খুব অল্প দিনের মধ্যেই। মাসিক আয় হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেল। বঙ্গবিভাগের পরও অনেক দিন কাটিয়েছিলেন সেখানে। তারপর আর থাকা গেল না। অচিন্ত্য বিলেত

চলে গেল। বছর পাঁচ পরে ফিরে এল মেমসাহেব বিয়ে করে। কলকাতায় মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক হল। তখন থেকে আবার ওঁদের দুজনের মধ্যে যোগাযোগ—যা নানা কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আবার নতুন করে স্থাপিত হল। দেশে মুসলমানদের অত্যাচার ক্রমে বাড়তে লাগল। হিন্দুদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদের দেশ থেকে তাড়াবার নিত্য নতুন উপায় বেরোতে লাগল। তিনি চলে আসবার সঙ্কল্প করলেন।

তিনি আসবার পর একে একে এই প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাপনা হল। অচিন্ত্য তার উপার্জনের অর্ধেকের উপর টাকা এই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য খরচ করছে। যাবার আগেও সে এই জন্য অনেক টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গেছে।

বিশ্বনাথ রাধা দুজনেই বলে উঠল, উনি কি চলে গেছেন?

আদিত্যবাবু বললেন, হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হল। ওর মেয়ের অসুখের খবর পেয়েছিল। আমাকে খবর দিয়েছিল। আমি গিয়ে দেখা করে এলাম। যাবার আগে মেয়েটির জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

চোখে জল এল রাধার। এত স্নেহ করতেন অথচ কাছে থাকলে বোঝা যেত না। প্রায় এক বছর তো কাছে কাছে ছিল। স্নেহ করতেন বুঝতে পারত, কিন্তু স্নেহ এত শান্ত স্নিগ্ধ ছিল যে তার স্পর্শমাত্র তার অন্তর পরিতৃপ্ত হয়ে উঠত। স্নেহের বিস্তার ও গভীরতা সম্বন্ধে খোঁজ করবার কথা মনে থাকত না।

আদিত্যবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিশ্বনাথ ও রাধা চলে এল।

॥ ১১ ॥

পরদিন রবিবার—বেলা নটা। রাধা গৌরদাসের ওখানে গেল। গৌরদাস স্নানাহ্নিক সেরে রান্না চড়িয়েছে। ভাত হচ্ছে আর গৌরদাস একখানা বই চোখের খুব কাছে এনে পড়বার চেষ্টা করছে। রাধার পায়ের শব্দে মুখ তুলে বলল, খোকা এসেছিস? কোথায় গিয়েছিলি?

রাধা বলল, কী পড়া হচ্ছে ?

গৌর বলল, ও, আপনি ! কী আর পড়ব বলুন ! খোকা একটা বই এনেছে কার কাছ থেকে চেয়ে। তাই দেখছিলাম।

রাধা জিজ্ঞেস করল, সকালে কিছু খেয়েছে ?

গৌরদাস বলল, রাত্রে যে খাবার আসে তার কিছুটা থাকে—তাই-ই সকালে খায়। একটু হেসে বলল, আগে সারাদিন মুড়ি খেত। আজকাল দিনের বেলায় ভাত, রাত্রে লুচি-সন্দেশ খায়। মেজাজটা বিগড়ে গেছে খোকার।

মুচকি হেসে রাধা বলল, কী করছে ?

গৌরদাস বলল, বাড়িতে থাকতেই চায় না। কোন কাজ করতে চায় না। বলে মায়ের সঙ্গে গেলে তো এ সব কিছু করতে হবে না। স্কুলে পড়তে যাব, স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে যাব। গাঁয়ের ছেলেরা স্কুলে পড়তে যায়, ও তাদের পিছু পিছু যায়, স্কুলের কাছে ঘোরাঘুরি করে। ফিরে আসে দুপুর পার করে। আবার বিকেলে বেরোয়। গাঁয়ের ছেলেরা খেলা করে, তাদের সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টা করে। ওরা আমল দেয় না। ভিখিরীর ছেলে—বাপ-বেটা দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে—দেখেছে তো ! নতুন প্যান্ট-গেঞ্জি পরলে কী হবে ?

চুপ করে ভাবছিল রাধা।

ভিখিরী কে করেছে ? সে, না, ভগবান করেছেন ? বন্যা হল। ধান হল না। ঝড়ে ঘরের চাল উড়ে গেল, খোকার অসুখ হল। চলে গেল তার মার কোল ছেড়ে। সে কী করবে ? যা করবার ভগবান করেছেন। যে রাধা-মাধবের ও আজীবন পূজো করেছে তিনিই পথে বসিয়েছেন ওকে। সে যদি ওর কাছেই থাকত বরাবর, চন্দ্রার খোকা হয়তো তারই কোলে আসত। সে হয়তো চন্দ্রার মত রোগে ভুগে একদিন মরে যেত।

রাধা বলল, দিনের বেলাতেও চোখে ভাল দেখতে পাও না ?

সাদা সাদা চোখের মণি দুটো তার মুখের দিকে তুলে ম্লান হেসে গৌরদাস বলল, না, খুব ঝাপসা দেখি। এই যে আপনি—

রাধা ধমক দিল, আবার আপনি।

গৌরদাস বলে উঠল, না না—তুমি। এই যে তুমি বসে আছ, বুঝতে পারছি কেউ রয়েছে, কিন্তু স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

রাধা বলল, রান্না কর কী করে?

গৌরদাস বলল, অভ্যেস হয়ে গেছে যে।

রাধা বলল, আগে কখনও রান্না করেছিলে?

গৌরদাস বলল, বিয়ের আগে করতাম। বিয়ের পর রাধাই করত। চমৎকার হাতের রান্না ছিল। একটু চুপ করে থেকে বলল, শহরে মানুষ। পড়ে গেল পাড়াগেঁয়ে বৈরাগীর হাতে। অনেক কষ্ট পেল। তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, আমার ভায়রাভাই রতন তাকে যে কোথায় নিয়ে গেল, কে জানে! অনেকদিন পরে কে যেন লিখেছিল রাধা রতন দুজনেই মরে গেছে।

রাধা বলল, তারপরেই বুঝি তুমি চন্দ্রাকে বিয়ে করে ফেললে? কণ্ঠস্বরে শ্লেষের সুর বাজল।

গৌর বলল, না তখন করি নি। ওকে স্ত্রী বলে নিতে মন রাজী ছিল না। রাধা ও রতন চলে যাবার পরে চন্দ্রাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হল।

রাধা বলল, তারপরই বুঝি মন রাজী হল?

গৌরদাস ম্লান হেসে বলল, না রাজী হয়ে উপায় ছিল না।

রাধা বলল, চন্দ্রাকে হারালে কি করে? অসুখ-বিসুখ হয়েছিল বুঝি?

গৌরদাস বলল, নতুন খোকা আসবার পরেই মা-ছেলে দুজনেই চলে গেল—

খোকার ডাক শোনা গেল। বাবার কাছে ছুটে আসতে আসতে রাধাকে দেখতে পেয়ে একমুখ হেসে বলে উঠল, মা এসেছেন! কাছে এসে কোল ঘেঁষে বসে পড়ল। বলল, কখন এলেন মা?

রাধা বলল, কোথায় গিয়েছিলে? তোমার বাবা খুঁজছিলেন তোমাকে।

খোকা বলল, জান বাবা, গাঁয়ের ছেলেরা খেলতে দিল আজ। আমি বুঝিয়ে বললাম, আমরা আর ভিক্ষে করি না। আমার এক মাসীমা আছেন খুব বড়লোক, আমাদের ভিক্ষে করতে দেবেন না বলেছেন।

সস্নেহে খোকার মাথায় হাত বুলিয়ে রাধা বলল, পাগল ছেলে।

খুব কাজ হয়েছে মা। ওদের যে মোড়ল, সে বলল, আমাকে দেখাবি তোর মাসীকে? বললাম, দেখাব। আমার মাসীমা খুব সুন্দর। মা দুর্গার মত দেখতে, খুব ভাল বাড়ি আছে। খোকা মাথা নেড়ে নেড়ে চোখের তারা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভ্রূ নাচিয়ে নাচিয়ে বলল।

রাধা বলল, আমার ভাল বাড়ি আছে জানলে কী করে?

খোকা বলল, আমি একদিন গিয়েছিলাম ওদিকে। আপনি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখলাম—

রাধা বলল, তুমি ভেতরে গেলে না কেন?

খোকা চুপ করে রইল। একটু পরে বলল, হ্যাঁ. মা, কবে আমরা এখান থেকে যাব? ওই বাড়িটাতে থাকব তো?

রাধা বলল, না বাবা। ও বাড়িটা বিক্রি হয়ে গেছে।

মনটা দমে গেল খোকার। বলল, তবে যে বললাম ওদের ওই বাড়িটা আমাদের হবে—

রাধা বলল, তাতে কী হয়েছে। আমরা তো এখানে থাকব না। অন্য জায়গায় যাব। সেখানে আমাদের বাড়ি আছে। অনেক ছেলেমেয়ে আছে—তাদের সঙ্গে পড়বে, খেলবে।

খোকা সাগ্রহে বলল, কবে যাব আমরা?

রাধা বলল, দু-তিন দিন পরে।

খোকা বলল, ওই যে ডাক্তারবাবু আছেন না—ওঁর ছেলে পড়তে যায় রোজ। সুন্দর দেখতে।

রাধা বলল, তোমার চেয়ে সুন্দর?

খোকা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ খু-উ-ব সুন্দর। এমন চমৎকার জামা পরে! কত রকম আঁকা আছে—গাছ মাছ—কত রকম জিনিস! পায়ে জুতো পরে—চকচকে কালো জুতো। খুব ভাল লেখাপড়া করে

নাকি স্কুলে! বলছিল, ও ওর বাবার মত ডাক্তার হবে। হ্যাঁ মা, আমিও ডাক্তার হতে পারব তো?

রাধা বলল, পারবে বইকি বাবা। খুব বড় ডাক্তার হবে। মনে মনে বলল, অচিন্ত্যদার মত।

গৌরদাস বসে বসে শুনছিল। বলল, আমার বিশ্বাস হয় না। কোথাও একটি চিরদিনের মত আশ্রয় পাব, খোকা বড় হবে, লেখাপড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হবে—বিশ্বাস হয় না।

রাধা বলল, রাধা-মাধবকে বল দুঃখের সমুদ্রে আর কত দিন ভাসাবে! আশ্রয় দাও। দুদিন সুখের মুখ যেন দেখে যেতে পারি।

গৌরদাস বলল, সুখের মধ্যে তো তাঁকে পাওয়া যায় না। তাই যাদের ভালবাসেন, তাদের দুঃখ দেন। দুঃখের মধ্যেই তাদের ধরা দেন। যতদিন ঘরে ছিলাম, কত আচার-বিচার করে কত আরাধনা করে ওঁর পূজো করেছি। কোনদিন ওকে বুকের মধ্যে পাই নি। পথে নেমে দুঃখের আগুনে পুড়তে পুড়তে ওঁকে বুকের মধ্যে পেয়েছি। যে কোন অবস্থায় চোখ বুজলেই আমার মনের পটে ফুটে ওঠে রাধা-মাধবের যুগল মূর্তি। ঘরে গেলে হয়তো আবার হারিয়ে যাবে। তাই পথ ছেড়ে ঘরে যেতে ইচ্ছে হয় না আমার।

শঙ্কিত কণ্ঠে বলে উঠল রাধা, সে কি! আমার সঙ্গে যাবে না?

গৌরদাস বলল, যাব—খোকার জন্য। ওকে তোমার কোলে বেশ করে বসিয়ে দিয়ে আবার চলে যাব।

রাধা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায়?

গৌরদাস হেসে বলল, আমার মাধবের কাছে—কদমতলায়। যেখানে অবিরাম বাঁশী বাজিয়ে তিনি আমায় ডাকছেন।

রাধা বলল, ও সব বুদ্ধি ছাড়। মাধব ঘরেও থাকেন। ডাকার মত ডাকতে পারলে ঘরেই ধরা দেন। খোকাকে মানুষ করতে হবে এটা মনে রেখ। এটা তোমারই দায়িত্ব। আমি সাহায্য করব মাত্র। যদি কোথাও চলে যাও, আমি দায়িত্ব নেব না। কলহের সুর বাজল রাধার কণ্ঠস্বরে।

গৌরদাস ভাবল, ঠিক রাধার মত স্বর। রাধাই নাকি! দুই বন্ধু একই ছাঁচে ঢালা! একই রকম দেখতে নাকি! ভাবতেই চোখে জল এল গৌরদাসের। রাধাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে নি সে। ভালবাসতে পারবে না। তার অন্তরের মধ্যে বসে আছে রাধা। বাইরের কোন আবিলতা তাকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারে নি, পারবে না।

ফেন উথলে পড়ল হাঁড়ি থেকে। রাধা খোকাকে বলল, ছাড়্ বাবা হাঁড়িতে একটু জল ঢেলে দিয়ে আসি।

হাঁড়িতে জল ঢেলে খুন্তি দিয়ে দুটো ভাত টিপে দেখল ভাত সেদ্ধ হয়ে গেছে। ফেন গেলে ভাত নামিয়ে একটা পাতায় ঢালল। আর একটা পাতা দিয়ে ভাতটা ঢেকে দিয়ে বলল, তরকারি রান্না করতে হবে না। তরকারি এনেছি আমি।

খোকা বলল, কই মা?

একপাশে একটা টিফিন-ক্যারিয়ারে তরকারি ছিল। রাধা দেখাল।

টিফিন-ক্যারিয়ারের পাশে আর একটি থলের দিকে দৃষ্টি পড়ল খোকার। বলে উঠল, ওটায় কি মা?

রাধা থলেটার মুখ খুলে দেখাল—কয়েকটা লেবু, দুটো আপেল রয়েছে। বলল, তোমার বাবার কাল একাদশী, তাই নিয়ে এসেছি। থলের ভিতর থেকে আর একটা জিনিস বার করে খোকার সামনে ধরতেই খোকা বলে উঠল, বিজলী আলো! ওটা কার মা?

রাধা বলল, তোমার।

সানন্দে খোকা চিৎকার করে উঠল, বাবা, মা বিজলী আলো এনেছেন আমার জন্যে।

গৌরদাস বলল, সে কী জিনিস?

খোকা বলল, ওই যে—টিপলেই আলো জ্বলে।

রাধা বলল, টর্চ বলে ওকে। খোকার জন্যে নিয়ে এলাম। সাপ-খোপ বেরোয় বলছিল—

খোকাকে বলল, অন্ধকারে আর বিনা আলোতে যেয়ো না।

ফেরবার আগে রাধা গৌরদাসকে বলল, ও-বেলা খাবার পাঠিয়ে দেব। কাল তোমার একাদশী। সকালে এসে রান্না করে দিয়ে যাব। আর একটা কথা, পরশু এখান থেকে চলে যাব। মনকে প্রস্তুত করে রেখ।

॥ ১২ ॥

সন্ধ্যার পর বিশ্বনাথ এল। জিজ্ঞাসা করল, পরশু যাওয়াই ঠিক তো?

রাধা বলল, হ্যাঁ ভাই।

বিশ্বনাথ বলল, আজ আমি আদিত্যবাবুকে লিখে দিয়েছি। সেখানে সংসার পাতবার জন্য সাজ-সরঞ্জাম কিছু কিছু কিনতে হবে তো?

রাধা বলল, এখান থেকে পাওয়া যাবে অনেক কিছু। কিছু কিনতেও হবে। ওদের কাপড়-চোপড়, বিছানাপত্র। একটু চুপ করে থেকে বলল, শিউশরণ আর মদনের ব্যবস্থা কী হবে?

বিশ্বনাথ বলল, সে ব্যবস্থা হয়েছে। যে ভদ্রলোক কাঠের গোলা কিনেছেন, তিনিই বাড়িটা কিনেছেন। আপনি গেলে তিনি এখানেই থাকবেন। আমি ওদের কথা বলাতে তিনি বললেন, তাঁর তো ঠাকুর-চাকরের দরকার হবে—ওদেরই রাখবেন।

রাধা জিজ্ঞেস করল ওদিকের খবর কী?

বিশ্বনাথ বলল, ওদিকের মানে—কমলা আর ব্রজলালের তো? বিয়ের আয়োজন চলছে। খুব শীগগির বিয়েটা হয়ে যাবে। ব্রজলাল এসেছে কিনা জানতে পারি নি। এলে তো কাছাকাছি থাকবে না। দূরের কোন কলিয়ারিতে আড্ডা গাড়বে।

রাধা বলল, ও আসবার আগে ভালয় ভালয় বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি ভাই।

বিশ্বনাথ বলল, কাল তা হলে একবার শহরে যাওয়া যাবে। আপনার টাকাটা তুলতে হবে, জিনিসপত্র যা যা দরকার কেনা যাবে।

পরের দিন ওরা দুজনে শহরে গেল। বিশ্বনাথ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলল। নানা দোকানে ঘুরে ঘুরে অনেক জিনিসপত্র কিনল।

সন্ধ্যে হয়ে এল। বিশ্বনাথ বলল, চলুন, একটু কিছু খাওয়া যাক।

একটা হোটেলে ঢুকল। পাঞ্জাবী হোটেল। শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল। আগে নাকি কোন এক বিলিতি সাহেবের ছিল। দেশে স্বাধীনতা আসার পর সাহেব হোটেলটা বিক্রি করে দিয়ে নিজের দেশে চলে গেছে। এখন একজন পাঞ্জাবী এর মালিক। দেশী ও বিলিতি দুরকমের খাদ্য ও পানীয় এখানে সরবরাহ করা হয়। নানা রকমের আনন্দোপভোগের ব্যবস্থাও আছে। দিশী-বিলিতি দুই শ্রেণীর পয়সাওয়ালা লোকের এখানে সমাবেশ ঘটে।

একটা হলঘরে গিয়ে বসল ওরা। বেশ লম্বা-চওড়া হলঘর। প্রায় এক শো জন লোকের খাওয়ার ব্যবস্থা আছে এই ঘরে। ঘরের দু পাশে সারিবন্দী অনেক ছোট ছোট টেবিল। এক-একটি টেবিলের চারপাশে চারখানা করে চেয়ার। সব বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেকটি টেবিলে সুন্দর সুন্দর ফুলদানিতে ফুল। দেওয়ালে দামী ফ্রেমে আঁটা দিশী-বিলিতি সুন্দর সুন্দর ছবি। বিদ্যুতালোকে সাজ-সরঞ্জাম সমেত সমস্ত ঘরটা ঝলমল করছে।

যাঁরা খাচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশেরই পোশাক-পরিচ্ছদ বিলিতি। দামী ও ঝকঝকে। চুপচাপ খেয়ে চলেছেন সব। মাঝে মাঝে মৃদু আলাপের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

এক পাশে একটা ছোট টেবিলে বসল ওরা। বেয়ারা এসে সঙ্গে সঙ্গে সেলাম জানাল। বিশ্বনাথ ওদের প্রয়োজনীয় খাবারের হুকুম দিল।

খেতে খেতে রাধাকে বিশ্বনাথ বলল, ওই পাশে তাকিয়ে দেখুন।

একটু দূরে একটা টেবিলে চারজন বসে ছিল। একজন যুবতী রূপবতী মেয়ে। অত্যুগ্র আধুনিকা বাঙালী মহিলার মত বেশ-ভূষা। কিন্তু চেহারায় অবাঙালী। সঙ্গে তিনজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। দুজনের পোশাক খাঁটি বিলিতি। একজনের খাঁটি দিশী।

রাধা মেয়েটিকে চিনল। কমলা। বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করল, চিনতে পেরেছেন ?

রাধা বলল, কিছুটা পেরেছি।

বিশ্বনাথ বলল, কমলা। সামনের ছেলেটির সঙ্গে ওর বিয়ে হবে। আর একজন খুব সম্ভব ছেলেটির কোন বন্ধু। প্রৌঢ় লোকটি কমলার বাবা।

খাওয়ার পর যাবার সময় দূরের একটি টেবিল থেকে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বিশ্বনাথকে বলল, সেলাম বাবুজী।

বিশ্বনাথ তার দিকে একবার তাকিয়ে সেলাম জানাল। সারা মুখ গোঁফদাড়িতে ঢাকা। চোখে চশমা। চেনা কণ্ঠস্বর মনে হল। মুখের ডৌলও চেনা মনে হল। ভাল ভাবে চিনতে পারল না। ভাবল, কোন পুরনো রোগী হবে বোধ হয়।

গাড়িতে উঠে রাধা বলল, মেয়েটি একেবারে বাঙালীর মত হয়ে গেছে।

বিশ্বনাথ বলল, পাঞ্জাবী আধুনিকারা বাঙালী মেয়েদের মত সাজ-পোশাক করতে ভালবাসে।

রাধা বলল, মেয়েটি সত্যিই রূপসী। ব্রজলাল যে পাগল হয়ে গেছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

বিশ্বনাথ বলল, এখন না হোক, ওর বিয়ে হয়ে যাওয়ার খবর পেলে ব্রজলাল সত্যি পাগল হবে। তখন সবাই মিলে ধরাধরি করে পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিতে হবে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে বিশ্বনাথ বলল, টাকাটা আপনার কাছেই রাখুন। ব্রজলাল যদি আসে, আমার কাছে বা বাবার কাছে টাকাটা আছে এটা সে নিশ্চয়ই ভাববে। কাজেই দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে ঢুঁ মারতে পারে। আপনার কাছে টাকা আছে এটা সে কিছুতেই ভাববে না। কিছুক্ষণ পরে বলল, আপনারা ওখানে যাবার পরে আমি আদিত্যবাবুকে বুঝিয়ে চিঠি দেব। উনি টাকাটা দিয়ে আপনার নামে সরকারী-কাগজ কিনে দেবেন।

রাধা বলল, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না?

বিশ্বনাথ বলল, আমার যাওয়া হবে না বোধ হয়। কয়েকটা কাজ আছে। আমার পরিচিত একজন ড্রাইভার আমার গাড়িতে করে আপনাদের পৌঁছে দেবে? আমি পরে একদিন গিয়ে আপনাদের দেখে আসব।

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াল। মদন ও শিউশরণ জিনিসপত্রগুলো একে একে ঘরে নিয়ে গেল। বিশ্বনাথ রাধার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে গেল। মদন শিউশরণ চলে যাবার পরে একটা প্যাকেট হাতে দিয়ে বলল, আপনার টাকাটা ট্রাঙ্কে কাপড়ের ভাঁজে রেখে দিন। আর কিছু টাকা আমার কাছে আছে, ফেরবার পথে দিয়ে যাব।

রাধা বলল, তুমি কি এখন আবার ডিসপেন্সারিতে যাবে?

হ্যাঁ, একবার ঘুরে আসি। কম্পাউণ্ডার খেতে যাবে। আমি না গেলে খেতে যেতে পারে না। ও খেয়ে ফিরে এলে তবে আমি ফিরব।

বিশ্বনাথ চলে গেল।

১৩

রাত প্রায় নটা। বিশ্বনাথ বসে আছে তার ডিসপেন্সারিতে। সেদিনকার কাগজখানা পড়ছে। কম্পাউণ্ডার খেতে গেছে। তার বাড়ি মাইল দুই দূরে একটা গ্রামে। গেছে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে—এখনও ফিরছে না। এদিকে রাত হয়ে যাচ্ছে। যাবার সময় রাধার সঙ্গে দেখা করে টাকাটা তাকে দিয়ে যেতে হবে—এই চিন্তাটা প্রায়ই মনের সামনে এসে একটা উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।

হঠাৎ জুতোর শব্দ শোনা গেল। মুখ তুলে চাইতেই বিশ্বনাথ দেখল, একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে সামনে। জিজ্ঞাসা করল, কে

লোকটি উঠে এসে সামনে দাঁড়াল। একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। বিশ্বনাথ বলল, কী দরকার আপনার?

কাছে এগিয়ে আসতেই বিশ্বনাথের মনে হল যে, লোকটি আজই শহরের হোটেলে তাকে সেলাম জানিয়েছিল—খুব সম্ভব সে-ই। লোকটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে টেনে টেনে বলল, আমাকে চিনতে পারছ না ?

মদের গন্ধ নাকে এল বিশ্বনাথের। চিনতে পারল সে। ব্রজলাল —চুল-দাড়ি-গোঁফ, হাতে বালা, এই সব দিয়ে চেহারাটা হুবহু পাঞ্জাবীদের মত করে তুলেছে। চেনা কষ্টকর। ভাবল, কী মতলবে এসেছে! মাতাল হয়ে এসেছে—টাকার খবরটা পেয়েছে নাকি! ভয় হল মনে। রাধার কথাটা মনে হল—ভালয়-ভালয় বেরিয়ে পড়তে পারলে বাঁচি ভাই।

বিশ্বনাথ বলল, বস।

ব্রজলাল কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল, বসবার সময় নেই। জরুরী দরকারে এসেছি আমি। বাড়ি বিক্রির টাকাটা আমাকে দিয়ে দাও।

বিশ্বনাথ বলল, সে টাকা তোমার প্রাপ্য নয়। যার প্রাপ্য তাকে দেওয়া হয়েছে।

ব্রজলাল উঁচু গলায় বলল, কার প্রাপ্য? ওই চাকরানীটার? যাকে নিয়ে শহরে ফুর্তি করে বেড়াচ্ছ? হোটেলে খানা খাওয়াচ্ছ ?

বিশ্বনাথ ধমকের সুরে বলল, চুপ কর ব্রজলাল। যা-তা বলো না।

ব্রজলাল বলল, ধমকাচ্ছ? মেজাজ খুব চড়ে উঠেছে দেখছি যে! দু পয়সা রোজগার হচ্ছে বুঝি? তবে পরের টাকায় লোভ কেন ?

বিশ্বনাথ বলল, পরের টাকার ওপর লোভ আমার নেই। তুমিই তার লোভে ছুটে এসেছ।

ব্রজলাল বলল, পরের টাকা? আমার ন্যায্য পাওনা টাকা।

বিশ্বনাথ বলল, তুমি তো তেওয়ারীর উত্তরাধিকারী নও। তবে তুমি যদি নিজের সন্তানের মত ব্যবহার করতে তোমাকেই দিতেন। তা তো কর নি। তিনি মরতে বসেছেন দেখেও তুমি তাঁকে ফেলে চলে গেলে। আর দিদি নিজের মেয়ের মত শেষ পর্যন্ত তাঁর সেবা

করল। সেই তো আপনার লোক। কাজেই তাকেই বাড়িটা উইল করে দিলেন।

ব্রজলাল মারমুখো হয়ে উঠে বলল, এ তোমার কারসাজি। মেয়েটাকে হাত করে টাকাটা মেরে দেবার চেষ্টা। কিন্তু আমি ছাড়ব না। একেবারে প্রাণে মেরে দিয়ে যাব। বলে এগিয়ে যেতেই বিশ্বনাথ উঠে দাঁড়িয়ে ড্রয়ারটা খুলতেই ব্রজলাল ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে। তাকে জাপটে ধরে একেবারে ঠেলে নিয়ে গিয়ে দেওয়াল চেপে ধরল। এমন সময়ে আর একটা লোক ছুটে এসে বিশ্বনাথকে ছুরি মারল। বিশ্বনাথ আর্তনাদ করে টলতে টলতে পড়ে গেল। ব্রজলাল ড্রয়ার খুলে টাকাকড়ি যা ছিল সব বার করে বিশ্বনাথের গাড়িটা নিয়ে চলে গেল।

ওদিকে, বাড়ির সামনের বারান্দায় বসে রাধা বিশ্বনাথের জন্য অপেক্ষা করছিল। ভাবছিল, এ বাড়িতে কতদিন কেটে গেল! ক্রীতদাসীর জীবন! আনন্দ ছিল না, সুখ ছিল না, সম্মান ছিল না। ছিল মনিবদের মর্জিমাফিক অনুগ্রহ বা নিগ্রহ। ভেবেছিল এমনি করেই আমরণ কাটবে। ভাগ্যবিধাতার হঠাৎ করুণা হল। দাসীত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিলেন। হারানো স্বামীকে হাতের কাছে এনে দিলেন। কেড়ে-নেওয়া সন্তানের বদলে সন্তান দিলেন। যে ঘর তার ভেঙে গিয়েছিল সে ঘর গড়ে তুলবার সুযোগ দিলেন। এ সুযোগ সে ছাড়বে না। স্বামীকে ও খোকাকে ঘিরে সে প্রাণপণ চেষ্টায় আবার নিজের সংসার গড়ে তুলবে। স্বামীর সেবা করবে, খোকাকে মানুষ করবে। খোকা বড় হবে, শিক্ষিত হবে, রোজগার করবে। তার বিয়ে দিয়ে মনের মত বউ নিয়ে আসবে ঘরে। তারপর ছোট ছোট নাতি-নাতনীরা আসবে। তাদের কোলে-পিঠে করে মানুষ করবে সে। তারপর একদিন—যেদিন মরণ আসবে, সবাইয়ের চোখের জলটুকু সম্বল করে এ জীবন থেকে বিদায় নেবে সে।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। শব্দ শুনে মনে হল বিশ্বনাথের গাড়ি। রাধা উঠে দাঁড়াল। কিন্তু যে আসছে, তাকে দেখে তো বিশ্বনাথ বলে

মনে হল না। বিশ্বনাথের চেয়ে আরও লম্বা রোগা। রাধার ভয় হল —কে তা হলে! লোকটি কাছে আসতেই রাধা বুঝতে পারল, বিশ্বনাথ নয়—একজন পাঞ্জাবী শিখ। রাধা ঘরের মধ্যে চলে যাবার উপক্রম করতেই লোকটা চিৎকার করে উঠল, দাঁড়াও। গলার স্বর শুনে রাধার বুঝতে বাকী রইল না, এ ব্রজলাল। তার মাতাল অবস্থার কণ্ঠস্বর চিনতে ভুল হবার কথা নয় তার।

ব্রজলাল কাছে এসে তার হাত চেপে ধরে বলল, চল আমার সঙ্গে।

ভয়ে সর্বশরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল তার। বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে লাগল। একবার ডাকবার চেষ্টা করল—মদন! শিউশরণ! কণ্ঠে স্বর ফুটল না।

আর একটা লোক এসে হাজির হল। তাকে ব্রজলাল ঘরে জিনিসপত্র যা আছে গাড়িতে তুলবার আদেশ দিল। ব্রজলাল রাধাকে টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই রাধা প্রাণপণ শক্তিতে একবার বলল, আমি যাব না, আমাকে ছেড়ে দাও, তোমার পায়ে ধরছি আমি।

ব্রজলাল বলল, যাবি না? বিশ্বনাথের সঙ্গে ফুর্তি করবার জন্যে থাকবি, না?—বলে ওর ঘাড় ধরে সামনের দিকে ঠেলে দিতেই রাধা বারান্দা থেকে মাটিতে পড়ে গিয়ে একটা আর্তনাদ করে স্তব্ধ হয়ে গেল। ব্রজলাল তার সংজ্ঞাহীন দেহটা দু হাতে তুলে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে ওঠাল। সঙ্গের লোকটা জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে যথাস্থানে রাখল। মদন ও শিউশরণ ছুটে এসে দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল। কিন্তু কিছু করতে সাহস করল না।

ব্রজলাল গাড়ির সামনে বসল। সঙ্গের লোকটা গাড়ি চালিয়ে দিল।

চেতনা ফিরে আসতেই রাধা বুঝতে পারল গাড়ির একটা কোণ ঘেঁষে সে পড়ে আছে। গাড়িটা দ্রুতবেগে ছুটছে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখল, আর একটি মেয়ে ওদিকে বসে আছে। কমলা বোধ হয়। ওকেও ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে তা হলে! ভাবল রাধা। আবার চোখ বুজে নির্জীবের মত পড়ে রইল সে।

অনেকক্ষণ পরে গাড়িটা প্রচণ্ড শব্দ করে থেমে গেল। রাধার দেহটা সামনে পড়ে যাবার উপক্রম হল। কোন রকমে সামলে দেখল, গাড়িটাকে ঘিরে অনেকগুলো লোক দাঁড়িয়ে। লোকগুলো ব্রজলালকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে মারতে শুরু করল। একজন গাড়িতে উঠে কমলাকে বার করে নিয়ে গেল। সঙ্গের লোকটাকেও খুব মারল। তারপর তারা একটা ট্রাকে চেপে চলে গেল।

ব্যাপার দেখে রাধা কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। কোন এক মুহূর্তে সে চেতনা হারিয়ে ফেলল।

যখন চেতনা ফিরে এল, গাড়ি তখন চলেছে। পাশে ব্রজলাল একটা কোণে ঠেস দিয়ে চোখ বুজে বসে আছে। তার ছেঁড়া জামা-পাতলুন রক্তে লাল হয়ে উঠেছে।

দুদিন পরে তারা ব্রজলালের কর্মস্থানে পৌঁছল। যখন পৌঁছল ব্রজলাল তখন জ্বরে অচৈতন্য। সঙ্গের লোকটি জখম হলেও একেবারে কাবু হয় নি।

কাঠের বেড়া দেওয়া খানিকটা জায়গা। তার মাঝখানে একটা টিনের ঘর। দুটো কুঠরি। তারই একটাতে ব্রজলালকে ধরাধরি করে ঢোকান হল।

সঙ্গের লোকটির নাম লছমনপ্রসাদ। ব্রজলালের দেশের লোক—সম্পর্কে ভাই। ব্রজলাল তাকে ব্যবসায়ের সহকারী হিসাবে আনিয়েছিল। লোকটি ব্রজলালের মত রুক্ষ প্রকৃতির নয়। ব্রজলালকে ভালবাসে। শহর থেকে ডাক্তার আনিয়ে ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করল।

রাধার টাকাটা অবশ্য লছমনপ্রসাদই হস্তগত করল। সে টাকাতেই সে কাঠের গোলাটা চালু করবার চেষ্টা করতে লাগল, চিকিৎসা ও সংসার খরচ চালাতে লাগল। ব্রজলালের সেবার ভার রাধার উপর পড়ল।

আততায়ীরা একটা বর্শা দিয়ে ব্রজলালের একটা পা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছিল। ঘা বিষাক্ত হয়ে উঠল। ডাক্তারবাবু হাসপাতালে গিয়ে পা-টা কাটিয়ে ফেলবার পরামর্শ দিলেন। ব্রজলাল রাজী হল না। ভুগতে লাগল।

শেষদিকে ব্রজলাল রাধার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে লাগল। রাধা সেবার ত্রুটি করত না মোটেই। ব্রজলাল তার সর্বনাশ করেছে—সেটা মনে কাঁটার মত বিঁধে থাকলেও সেবায় সে তিলমাত্র অবহেলা করত না। ব্রজলাল তা মর্মে মর্মে বুঝেছিল। শেষে তার হাত ধরে ক্ষমা চাইল একদিন। বলল, খুব অন্যায় করেছি। মাপ কর আমাকে। যদি ভাল হই, নিজে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসব।

ব্রজলাল হাসপাতালে যেতে রাজী হল শেষে। শরীরটা তার অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিল। রক্ত ছিল না দেহে। যাবার আগে কাঁদতে লাগল। বলল, আর ফিরব না। রাধাকে বলল, আমি যতদিন থাকি, এখানে থেকো। এক-একবার দেখতে যেয়ো। যদি ফিরে আসি, আমি তোমাকে পৌঁছে দেব। আর যদি না ফিরি, লছমন তোমার ফেরার ব্যবস্থা করবে।

মাস-দুই ভুগে মারা গেল ব্রজলাল।

১৪

প্রায় আট মাস পরে রাধা তার সেই পুরনো বাড়ির সামনে একটা বাস থেকে নামল। আগের চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছে। রঙটা আরও মলিন হয়ে গেছে। মাথার চুলগুলো রুক্ষ। মাথার সামনে কুচো চুলগুলো কপালে এসে পড়েছে। পরনে মলিন শাড়ি ও সেমিজ। হাতে একটা পুঁটলি। লছমনপ্রসাদ ভাল ব্যবহার করলেও তার টাকা বা জিনিসপত্র কিছুই তাকে ফেরত দেয় নি।

বাসটা চলে গেলে রাধা অনেকক্ষণ বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। দীর্ঘ পথ এসে ক্লান্তিতে কোথাও শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। খিদে পেয়েছিল খুব। কিন্তু আশ্রয় কোথায়? এক বিশ্বনাথের বাড়ি আছে। সেখানে গেলে দু-চারদিনের জন্যে আশ্রয় পাওয়া যাবে নিশ্চয়। সেখান থেকে সে গৌরদাস আর খোকার খোঁজ করবে। জমিদারবাবুরা তাড়িয়ে দিলেও বিশ্বনাথ নিশ্চয় তাদের কিছু ব্যবস্থা করবে। গৌরদাস ও

খোকাকে নিয়ে সে আদিত্যবাবুর কাছে চলে যাবে। আদিত্যবাবুকে তার দেরি হবার কারণটা বুঝিয়ে বললে নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না। এখন সে একেবারে নিঃস্ব হলেও অচিন্ত্যদা যে বাড়ি তাকে দিয়ে গেছেন, তা সে নিশ্চয় পাবে। সেখানেই স্বামী-সন্তান নিয়ে বাস করবে। চাকরির সামান্য টাকাতে কোন রকমে চালিয়ে নেবে।

একটি লোক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। তাকে রাধা জিজ্ঞেস করল, এখানে মদন বলে কেউ আছে?

লোকটি বলল, আছে।

একবার ডেকে দিতে পার তাকে?

লোকটি মদনকে ডেকে দিতে গেল।

মদন এল। রাধার দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলে উঠল, আপনি! দিদিমণি, আপনি বেঁচে আছেন? আমরা ভেবেছিলাম—

রাধা বলল, মলেই তো বাঁচতাম। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার হল কই!

মদন চুপ করে রাধার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাধা জিজ্ঞাসা করল, বিশ্বনাথের খবর রাখিস তো? কেমন আছে?

মদন বলল, আপনি জানেন না? আর জানবেনই বা কী করে! বিশ্বনাথবাবুর ডিসপেন্সারিতে ডাকাতি হয়েছিল। যে রাত্রে এখানে হয়েছিল, ঠিক সেই রাত্রে। ওঁকে ছুরি মেরে ঘায়েল করে ওঁর টাকাকড়ি নিয়ে পালিয়েছিল। হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল মাস তিনেক। বাড়ি ফিরে ওখানকার ডিসপেন্সারি তুলে দিলেন। কোথায় একটা চাকরি নিয়ে চলে গেছেন। ওঁর বাবা তো মারা গেছেন মাস দুই আগে। তারপর ওঁর মা বউ ছেলে ওঁর কাছে চলে গেছেন। ওঁদের বাড়ি এখন খালি পড়ে আছে।

রাধার মুখ শুকিয়ে গেল। কোথায় যাবে তা হলে!

রাধা জিজ্ঞাসা করল, সেই অন্ধ ভিখিরী এখনও তোদের গাঁয়ে থাকে?

মদন বলল, আজ্ঞে না। আপনার যাওয়ার মাস দুই পরে ছেলেটার

জ্বর হল। কে চিকিৎসা করাবে? বিনা চিকিৎসায় ছেলেটা মারা গেল। তারপর সেই কানা ভিখিরীটা একদিন কোথায় চলে গেল।

রাধার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করতে লাগল।

সামনের দিকে তাকাল। দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। রাধার মনে হল, মাঠ নয়, মরুভূমি—পথহীন জনহীন অন্তহীন। এরই বুকের উপর দিয়ে আর যাত্রা শুরু হয়েছে সেই কিশোরী অবস্থা থেকে। চলেছে সারা যৌবন ধরে—চলবে বার্ধক্যশেষ মৃত্যু পর্যন্ত।

এই মরুভূমির বুকে একটি সুন্দর জীবনের মনোহর ছবি ক্ষণেকের জন্য ফুটে উঠেছিল। কাছে আসতে না আসতেই তা মিলিয়ে গেল।